জীবিত মোগল বংশধর

সুবীরকুমার পাল

জীবিত মোগল বংশধর

সুবীরকুমার পাল

Boier Somahar

Click here

to join our Telegram Channel

SOPAN

সোপান

কলকাতা

শ্রদ্ধার্ঘ্য

অগ্রজ সম্মাননীয় শ্রী প্রণব ভট্টাচার্য

কে

सुल्ताना बेगम
बहादुरशाह जफ़र की परपौत्र वधु
103/12/सी, फोरशोर रोड
पो.ऑ.-शिबपुर
हावड़ा-711 102 (प.ब.)
e-mail : moghulbegum@yahoo.co.in

मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि लेखक और शोधार्थी श्री सुबीर कुमार पाल भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुरशाह जफ़र के वर्तमान में जीवित वंशजों के बारे में एक पुस्तक पर काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे संबंधित जानकारी प्राप्त की और उपलब्ध पुराने रिकॉर्ड की प्रतिलिपियां प्राप्त कीं। पुस्तक की पांडुलिपि तैयार होने के पश्चात मुझे अवलोकन के लिए उपलब्ध भी कराई। पांडुलिपि में मैंने अपने से संबद्ध अंश के तथ्यों को सटीक पाया।

मुझे आशा है कि यह पुस्तक बादशाह के वर्तमान में मौजूद वंशजों के बारे में आवश्यक जानकारी देने में सफल होगी और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

पुस्तक की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं।

दिनांक : 01.10.2018

विनीत
Sultana Begum
सुल्ताना बेगम

মুখবন্ধ

সিপাহি বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই শতাধিক মোগল বংশের পুরুষ-সদস্যদের ইংরেজরা হত্যা করেছিল। তাদের মুল লক্ষ্য ছিল একজনকেও বাঁচিয়ে না রাখা। রাজ্য না থাকলেও১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের আগে সিংহাসন টুকু ছিল, তবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সিদ্ধান্ত নিয়েই রেখেছিল বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ জাফরের জীবনাবসান ঘটলে *বাদশাহ* হিসাবে নতুন কোনও ব্যক্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। ১৫২৬ থেকে ১৭০৭ সালের প্রথমে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত মোগলদের কাহিনির প্রবাহ একরকম। তারপর সে প্রবাহে আর কোনও দিন গতি সঞ্চার হয়নি। নিমজ্জমান জাহাজকে রক্ষা করবার মতো সাহস বা ক্ষমতা সম্পন্ন কোনও পুরুষের উদয় হয়নি। ১৭০৭ থেকে ১৮৫৭ এই সুদীর্ঘ ১৫০ বছর ধরে মসনদে একাধিক মোগল পুরুষ আরোহন করেছেন ঠিকই কিন্তু ঝড়ের মুখে হাল ধরে নৌকাকে তীরে নিয়ে যাওয়ার মতো যোগ্যতা তাদের কারও ছিল না। তবে আমোদ-প্রমোদ, রমণীসঙ্গ, সুরাপান, শিকার উৎসব প্রভৃতিতে তাঁরা দক্ষ ছিলেন।

১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহে গণহত্যা দ্বারা ইংরেজরা মোগলদের শেষ করবে ভেবেছিল, তা সত্ত্বেও মির্জা খোয়ায়েশ পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। সুদূর বর্মায় রেঙ্গুনে পিতার সঙ্গে ছিলেন জওয়ান বখত ও মির্জা শাহ আব্বাস, মির্জা শাহ আব্বাস ও তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম হারিয়ে গিয়েছেন। জওয়ান বখ্তের পৌত্র বেদার বখ্ত, শিশু বেদার বখ্তের মাতামহ তাকে নিয়ে হিন্দুস্থানে চলে আসেন, সেই সময় হিন্দুস্থানে কোম্পানির শাসন শেষ হয়ে সরাসরি মহারানি ভিক্টোরিয়ার নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল। পার্লামেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে প্রশাসন পরিচালনা আরম্ভ হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের হিন্দুস্থান ও ১৯২৩ অথবা ১৯২৪ সালের হিন্দুস্থানের মধ্যে পার্থক্য ছিল বিস্তর। ভারতবর্ষে তখন স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন অন্য মাত্রা নিয়েছিল। বিভিন্ন প্রান্তে চলছিল বিপ্লবী কার্যকলাপ ও অহিংস আন্দোলন। এরকম এক পরিস্থিতিতে শিশু বেদার হিন্দুস্থানে তার পূর্ব পুরুষদের ভিটেয় পা রাখল। এরপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল স্বাধীন ভারতবর্ষে। আমরা ভুলতে বসলাম ইতিহাস, অস্বীকার করা আরম্ভ হল ইতিহাসকে। বাহাদুর শাহ জাফর ছিলেন

শেষ মোগল বাদশাহ্ এবং ইংরেজদের চোখে বিদ্রোহের প্রধান ষড়যন্ত্রী। তাঁকে নির্বাসনে পাঠানোর পর অমানবিক আচরণ করা হয় তাঁর সঙ্গে, প্রতিটি ধাপে, প্রতিটি পদক্ষেপে অপমানে জর্জরিত করা হয়।

এখন যে সমস্ত রাজা-মহারাজাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভা ও লোকসভা ও রাজ্যসভায় তাঁদের ১% সিপাহি বিদ্রোহের সময় হিন্দুস্থানের জনগণের পক্ষে দাঁড়ায়নি, আজ তারাই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। পাশাপাশি উপেক্ষিত শেষ মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফর ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

নানা সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুসরণ করে পৌঁছে যাই হাওড়ায় সুলতানা বেগমের কাছে এবং হায়দরাবাদে, টুসি পরিবারের খোঁজ পাওয়া খুবই জরুরি, কারণ হাবিব উদ্দিন টুসির বক্তব্য সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নয়, দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র নিজেকে প্রচার করতেই তিনি ব্যস্ত। এই কারণে এখনও খুঁজে চলেছি তাঁদেরকে।

বারাসতের নিজাম উদ্দিন আহমদ ব্যক্তিগতভাবে এবং তাঁদের বসিরহাটের [মালতিপুর, চৈতা] ওয়াক্ফ্ বোর্ডের তরফে বিভিন্ন সময় সুলতানা বেগম কে আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন এবং এখনও দিয়ে চলেছেন। 'মোগল খানদান' শব্দের প্রতি গুরুত্ব না দিলেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রবীণ নাগরিকদের প্রতিও তো আমরা সাহায্য করতে পারি। এখনও পর্যন্ত তাঁর নিজস্ব কোনও বাসস্থান নেই, নিজামউদ্দিনজি চেষ্টা জারি রেখেছেন সুলতানা বেগমকে এক খণ্ড জমি দেওয়া যায় কি না, একটা ছোট্ট মাথা গোঁজবার মতো আস্তানা দেওয়া যায় কি না। হায়দরাবাদে বসবাসকারী জনৈক বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে টেলিফোনে অন্তত পাঁচশতবার কথা বলেও তাঁর সাক্ষাতে কথা বলতে ব্যর্থ হই, তিনি কতবার যে সহায়তা করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। প্রতিবারই এড়িয়ে গিয়েছেন। কারণ জানতে পারিনি।

তত্ত্বের কচকচানি কপচিয়ে বারাসতের জেলাভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের দপ্তরের পরমর্শদাতা ও ভাষণ বিশেষজ্ঞ 'মণ্ডল' আধিকারিক মহাশয় সুলতানা বেগমের পাট্টা চেয়ে আবেদনপত্রটি নাকচ করেন। সুলতানা বেগমের সঙ্গে আমিও হতাশ হই, কিন্তু 'মণ্ডল' আধিকারিক মহাশয়ের পাশাপাশি নিজামউদ্দিন আহমদের উদ্যোগে উৎসাহ পাই।

এই বই ইতিহাসকে নতুন করে স্মরণ করবার জন্য। জোর করে প্রকৃত তথ্য বা ইতিহাসকে অস্বীকার করা যায় না। অস্বীকার করে কোনও লাভও হয় না, শুধুমাত্র আত্মতৃপ্তি জাগে।

হায়দরাবাদের মালাকপেট পুলিশ থানার অন্তর্গত আশমান গড় অঞ্চলে বসবাস করেন টুসি পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ, কোনও ব্যক্তির অনুকূলে তাঁদের সম্বন্ধে সঠিক তথ্য ও ঠিকানা থাকলে জানালে বাধিত হবো।

মোগল জীবিত বংশধরগণের সম্পর্কে অন্য কোনও সংবাদ থাকলে সহৃদয় ব্যক্তিকে তা জানাতে অনুরোধ করছি। আশা করি ইতিহাস প্রিয় পাঠককে এই বই খুশি করবে। জীবিত মোগলদের সম্বন্ধে সম্ভবত এটিই প্রথম বই। পাঠকের মতামত আহ্বান করছি।

সুবীর কুমার পাল।
৭৫৯৫৯৬৩৩৭৫

১, বিবেকানন্দনগর, উদয়রাজপুর,
মধ্যমগ্রাম ৭০০ ১২৯

১০, অক্টোবর, ২০১৮

সূচিপত্র

১. ধূসর গুরুত্বপূর্ণ অতীত ১৫

১.১. জাফরের শেষদিন ; ১.২ বেগম জিনাত মহল এবং বাদশাহের পরিবার; ১.৩ রক্তাক্ত দিনগুলি; ১.৪ মির্জা খোয়ায়েশ (কুয়াইশ); ১.৫ মির্জা আবদুল্লা; ১.৬ বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত; ১.৭ নির্বাসনের পথে যাত্রা; ১.৮ শাহজানা মির্জা জওয়ান বখ্‌ত; ১.৯ মির্জা ফতে-উল-মুলুক বাহাদুর ফকরু; ১.১০ মির্জা ফকরু ও মির্জা গালিব; ১.১১.শাহজাদা মির্জা মিজর সুলতান; ১.১২ মির্জা বখ্‌তওয়ার শাহ; ১.১৩ মির্জা আবদুল্লা; ১.১৪ মির্জা মুগল; ১.১৫ সিপাহি বিদ্রোহ ও বেগম জিনাত মহল।

২. রেঙ্গুনের যন্ত্রণাময় দিনগুলি ৫৩

২.১ মুখবন্ধ; ২.২ রেঙ্গুনে শাহজাদা মির্জা জওয়ান বখত এবং তাঁর পত্নী; ২.৩ মির্জা শাহ আব্বাস; ২.৪ নবাব শাহ জমানি বেগম সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন ডেভিসের মতামত; ২.৫. রেঙ্গুনে বেগম জিনাত মহল; ২.৬ মির্জা জওয়ান বখ্‌তের মৃত্যু; ২.৭ শাহজাদা মির্জা জামশেদ বখ্‌ত ; ২.৮ সংবাদ পত্রের প্রতিকোন; ২.৯ যে জিনিসপত্র রেঙ্গুন পুলিশ দখল (Scize) করেছিল তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা; ২.১০ শাহজাদা মির্জা জামসেদ বখ্‌তের বংশ বৃক্ষ; ২.১১ শাহজাদা মির্জা বেদার বখত।

৩. স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ৭৫

৩.১ হিন্দুস্থানে শাহজাদা মির্জা বেদার বখ্‌ত; ৩.২ ভাগলপুর এবং কলকাতায় শাহজাদা মির্জা বেদার বখ্‌ত; ৩.৩ কলকাতায় স্থায়ীভাবে মির্জা বেদার বখ্‌ত; ৩.৪ শাহজাদা মির্জা বেদার বখ্‌তের বিবাহ; ৩.৫ বেদার বখ্‌তের সন্তানগণ; ৩.৬ বেদার বখ্‌তের অসুস্থতা ও মৃত্যু।

৪. পশ্চিমবঙ্গ খানদান ৮৬

৪.১ শাহজাদার মৃত্যুর পরবর্তী সংকট ও জীবন সংগ্রাম; ৪.২ বাসস্থান সংক্রান্ত স্বস্তি ও অসস্তি; ৪.৩ হিন্দু না ওরা মুসলিম; ৪.৪ আশ্রয়ের সন্ধানে হাওড়ায়; ৪.৫ প্রধান মন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়েজি কর্তৃক আর্থিক সাহায্য দান; ৪.৬ মাননীয়া

মমতা ব্যানার্জী, কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রী এবং মাননীয় প্রয়াত তপন সিকদার, টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রীর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান; ৪.৭ ওয়াক্‌ফ বোর্ড, তাজ মহল এবং সুলতান বেগম;৪.৮ মুম্বাই দর্পণে সুলতানা বেগম; ৪.৯ কাল বৈশাখী ঝড়; ৪.১০ কলকাতার কড়চা ও রাজদর্শন; ৪.১১ আবাসন পাওয়ার জন্য পুনরায় উদ্যোগ গ্রহণ; ৪.১২ সুড়ঙ্গ শেষে আশার আলো; ৪.১৩ সরকারি আবাসন পাওয়ার জন্য তৃতীয় প্রচেষ্টা।

৫. এখন যেমন ১০৯

৫.১. মোগল সম্রাজ্ঞীর মুখোমুখি; ৫.২ ক্রান্তি দিবস; ৫.৩ মোগল বংশ বৃক্ষে সুলতান বেগমের অবস্থান।

৬. দিল্লি খানদান ১১৬

৬.১ মির্জা ফরখুন্দা জামাল; ৬.২ ফরখন্দা জামালের পুত্র; ৬.৩ পাকিজা সুলতান বেগম; ৬.৪ এক মাত্র মোগল বংশধর?; ৬.৫ কমর সুলতান বেগম; ৬.৬ বেগম তাহিরা সুলতান।

৭. হায়দরাবাদ খানদান ১২২

৭.১ মির্জা খোয়ায়েশ (কুয়াইশ), নেপাল থেকে ঔরঙ্গাবাদ; ৭.২ ঔরঙ্গাবাদ থেকে নিজাম রাজ্যে; ৭.৩ হায়দরাবাদে মির্জা আবদুল্লা; ৭.৪ মির্জা গফফর ওরকে মির্জা প্যায়ারে; ৭.৫. হুসান জহানয়ারা বেগম ও তাঁর সন্তানগণ; ৭.৬ লায়লা উমাহানি বেগম ও তার সন্তানগণ; ৭.৬ (১) জিয়াউদ্দিন টুসি; ৭.৬ (২) মসিউদ্দিন টুসি; ৭.৭ প্রকৃত মোগল বংশধর কে?; ৭.৮ আত্মপ্রচার সর্বস্ব ইয়াকুব হাবিব উদ্দিন টুসি; ৭.৯ নিষিদ্ধ তথ্য চিত্র; ৭.৯ মোগল বংশের হায়দরাবাদ শাখার বংশতালিকা।

৮. পরিশিষ্ট ১৩৬

ধূসর গুরুত্বপূর্ণ অতীত

১.১. জাফরের শেষদিন।

১৭০৭ সালে আলমগির ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শাহ্ আলম 'কুতুবউদ্দিন প্রথম বাহাদুর শাহ' খেতাব নিয়ে মোগল খানদানের উত্তরাধিকারী হিসাবে দিল্লির তক্ত-ই-তৌসে আসীন হয়েছিলেন, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তামাম হিন্দুস্থানের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন শাসকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করতে থাকে। মারাঠা, শিখ, জাঠ, রাজপুত প্রভৃতি শক্তি শাহ্ আলমের কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করতে আরম্ভ করে। বাংলা, হায়দরাবাদ, দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সরাসরি মোগলশক্তিকে তাচ্ছিল্য করা শুরু হয়। সে বিদ্রোহ দমন করার মতো প্রশাসনিক দক্ষতা তখনকার মোগল বাদশাহের ছিল না। সেই সময় থেকে ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে নাদির শাহের হিন্দুস্থান আক্রমণ পর্যন্ত ৬(ছয়) জন মোগল পুরুষ বাদশাহ্ হিসাবে মসনদে বসেছিলেন। মোটামুটি ১৭৩৯ সাল পর্যন্ত মোগল প্রশাসনের স্পষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায়, কিন্তু তারপর সে বংশের কাহিনি যেন বিলীন হয়ে গিয়েছে অথবা আবছা। ১৫২৬ থেকে ১৭০৭ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১৮১ বছর যে মোগল প্রশাসন দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করেছিল ধীরে ধীরে তা একেবারেই যেন উবে গিয়েছিল। বিশাল বিশাল প্রাসাদ, দুর্গগুলি শুধু প্রতীকী হয়ে দাঁড়িয়েছিল, বাইরে ও ভিতরে তার জৌলুস খসে গিয়েছিল। তার ভোগ, বিলাস, রোশনাই, জাঁকজমক পূর্ণ হাজারো উৎসব, জন্মদিন ও অন্য অনুষ্ঠানে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা বিতরণ, হাজার হাজার মানুষকে অন্ন ও অন্যান্য সাহায্য প্রদান এসবই একেবারে থমকে গিয়েছিল। যে শাহি প্রশাসনের ছিল কয়েক লক্ষ সৈন্য বাহিনী, তা কমতে কমতে কয়েকজন মাত্র দাঁড়িয়ে ছিল। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের আগে মানুষের মন থেকে মোগল রাজশক্তির অস্তিত্ব প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। ১৮৫৭ সালে হঠাৎ যেন তাদের মনে হয়েছিল হিন্দুস্থানের মোগল খানদানের কথা। ১৭৩৯ সালে নাদির শাহের হিন্দুস্থান আক্রমণের সময় মোগল বাদশাহ্ ছিলেন নাসির উদ্দিন মুহম্মদ শাহ্। তিনি নয় নয় করে ১৭১৯ থেকে ১৭৪৮ সাল পর্যন্ত

দীর্ঘ ২৯ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তবে সে নামেই 'রাজত্ব' আকবর-জাহাঙ্গির-শাহজাহান-আলমগিরের প্রশাসনের ক্ষয়িষ্ণু ছায়া মাত্র। আর ১৮৫৭ সালের ১০ মে (ভিন্ন মতে ১১ মে) যখন সিপাহি বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছিল 'মোগলবাদশাহ্' হিসাবে দিল্লির তক্ত-ই-তৌসে ছিলেন সিরাজউদ্দিন বাহাদুর শাহ্ (দ্বিতীয়) জাফর। তিনি মসনদে আসীন হয়েছিলেন ১৮৩৭ সালে, অর্থাৎ ততদিনে তিনি ২০(কুড়ি) টি বছর 'রাজত্ব' সম্পূর্ণ করেছিলেন। তাঁর প্রবল প্রতাপান্বিত পূর্বপুরুষদের মতো যথানিয়মে দেওয়ান-ই-আমে দরবার বসত, দেওয়ান-ই-খাসে আলোচনা হত, ঝরোখা থেকে তিনি প্রজাদের দর্শন দিতেন, তাঁরও 'হারেম' ছিল, ছিল সব কিছুই, কিন্তু সে প্রাসাদ আগের মতো হাজার রঙিন আলোয় রাত্রে ঝলমল করত না ইরান, তুরান কাশ্মীর বা গুজরা তর মূল্যবান গালিচায় ঢাকা থাকত না দরবার কক্ষসহ গোটা হারেম, সুখদাস চোল বা জিনজিন চালের বিরিয়ানের ('বিরিয়ানি' শব্দটি ভুল) মোগল রন্ধনশালা, গন্ধে ম' ম' করত না প্রতিদিন শতশত আমিষ, নিরামিষ পদ রান্না হত না; দরবারে নানা প্রান্ত থেকে আমির, ওমরাহরা আসত না, বিদেশি দূতেরা অপেক্ষায় থাকত না বাদশাহের সাক্ষাতের প্রত্যাশা করে; যুবতী, সুন্দরী নৃত্য শিল্পীদের ঘুঙুরের আওয়াজ শোনা যেত না বাদশাহের প্রমোদ কক্ষে; জাহাঙ্গিরের সময় একটি নাদিরির (এক বিশেষ ধরনের কুর্তা) মূল্য ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা (১ তোলা সোনার মূল্য ছিল ১০ টাকা), সে 'নাদিরি' তো দূর অস্ত্, অতি সাধারণ মানের পোশাক পরতেন 'শাহজাহা', 'শাহ্জাদি', 'সম্রাজ্ঞী', এমনকী স্বয়ং 'বাদশাহ্' পর্যন্ত। তাহলে মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জাফরের দরবারে কী হত? কবিতা, গজল পাঠের আসর বসত প্রতিদিন। দিল্লির বাছাই করা উর্দু ও ফারসি কবি ও লেখকরা 'দরবার আলো' করে বসতেন, তাঁদের মধ্যমনি ছিলেন স্বয়ং বাহাদুর শাহ্ জাফর তথা মোগল শাহ্ য়েন শাহ্। তিনি ছিলেন উঁচু মানের কবি। তিনি কবিতা লিখতেন, গজল লিখতেন, গাইতেন, ছিলেন চিত্রশিল্পের সমঝদার। আকবর থেকে শাহ্জাহান পর্যন্ত তিন মোগল বাদ্শাহ্ই শিল্প ও শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তারিফ করতেন। সে তারিফ শুধুমাত্র হাত তালিতে নয়, কৌশলী মিষ্টি ভাষায় নয়, নিছক গম্ভীর খেতাব প্রদানে নয়, শত সহস্র, লক্ষ অর্থ, স্বর্ণমুদ্রা, মোহর পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হত সে সব শিল্পীদের। ঔরঙ্গজেবের সময় ওরকম গানের জলসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সুন্দরী, যুবতীদের নৃত্যানুষ্ঠান উপভোগ করতেন আলমগির বাদশাহ্।

বাদশাহ্ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ জাফরের দিন চলত ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রদত্ত সামান্য ভাতার উপর। আলোর রোশনাই বা যুবতীর নৃত্যানুষ্ঠান উপভোগ করতে যে জিনিসটির প্রয়োজন হত, তা ছিল অর্থ, বা রাজস্ব; যাবতীয় বিলাস, ব্যসন, জাঁক সবেরই মূলে ছিল চকচকে ওই বস্তুটির, যা মোগল কোষাগারে কিছুই ছিল না। শাহ্জাহানের রাজত্বের শেষ দিকে গোটা মোগল হিন্দুস্থান থেকে প্রতিবছর সংগৃহীত রাজস্ব, বাণিজ্য শুল্ক, পথ শুল্ক ইত্যাদি মিলিয়ে পরিমাণ ছিল ২২(বাইশ) কোটি টাকা [সূত্র : স্যার যদুনাথ সরকার, ঔরঙ্গজেবের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অষ্টম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৬৭, ১৬৮]। সেই নিরিখে মাত্র কয়েক লক্ষ টাকার ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রদত্ত ভাতা দিয়ে বাহাদুর শাহ্কে তাঁর 'মোগল প্রশাসন', 'দরবার', হারেমসহ অন্যান্য খরচ চালাতে হত। সমান্য অর্থও রাজস্ব হিসাবে মোগল কোষাগারে জমা হত না।

আর কিছু থাক বা না থাক মোগল 'হারেম' টি ছিল বেশ ঈর্ষণীয়।

বাহাদুর শাহ্ জাফরের জন্ম ২৪ অথবা ২৫ অক্টোবর, ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দ, তিনি মসনদে বসেন ১৮৩৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর, তখন তাঁর বয়স ছিল ৬২ বছর। সেই 'তরুণ' বাদশাহ্ ১৮৪০ সালে ৬৫ বছর বয়সে ১৯ বর্ষীয়া যুবতী জিনাত মহলকে বিবাহ করেন, উক্ত বেগমের গর্ভে ১৮৪১ সালে একটি পুত্র সন্তান জন্মায়, জওয়ান বখ্ত। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় বাদশাহ্ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ জাফরের ৮ জন পত্নীসহ মোট ৬০ জন সঙ্গিনী ছিল, সব মিলিয়ে জাফরের ১৬ জন পুত্র (অন্য সূত্রে ২২ জন) ও ৩১ জন কন্যা ছিল। তাঁর কনিষ্ঠ তথা শেষ সন্তান শাহ্জাদা মির্জা শাহ্ আব্বাসের যখন জন্ম হয়, বাদশাহের বয়স তখন ৭০+, জিনাত মহলের আগে প্রধানা বেগম ছিলেন তাজমহল বেগম, কিন্তু বিবাহের কয়েকমাসের মধ্যেই উনিশ বর্ষীয়া সুন্দরী জিনাত মহল তাজ বেগমকে সরিয়ে সেই স্থানটি নেন [সূত্র : The Last Mughal, W. Dalrymple, পৃষ্ঠা ৪২-৪৩; Parves লিখিত Bahadur Shah Zafr, পৃষ্ঠা 81-85]

সিপাহি বিদ্রোহকে কড়া হাতে দমন করার পর বাহাদুর শাহ্ জাফরসহ সমস্ত মোগল প্রাসাদের সদস্য সদস্যাদের ইংরেজরা বন্দি করে, একহাজারের বেশি মোগল বংশের সদস্যদের ইংরেজরা গুলি করে অথবা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেছিল। সেনাপতি হাডসন ছিল ওই হত্যাকাণ্ডের নেতা। পরাজিত, ভীত বাহাদুরশাহ্ জাফর আশ্রয় নিয়েছিলেন পূর্বপুরুষ হুমায়ুনের সমাধি সৌধের মধ্যে। হাডসনের কাছ থেকে জীবনের নিরাপত্তা পেয়ে বাহাদুরশাহ্ জাফর আত্মসমর্পণ করেন। লাল

কেল্লায় সম্রাটের বিচার হয় এবং তিনি অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত হন। হাডসন কথা দেওয়ায় সম্রাটকে হত্যা করা হয়নি, কিন্তু ইংরেজরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল বাহাদুর শাহ্ জাফরকে হিন্দুস্থান থেকে নির্বাসিত করা হবে। তিনটি জায়গা ইংরেজরা স্থির করেছিল, ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। শেষ পর্যন্ত তাঁকে বন্দিবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় সুদূর ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে।

১৮৫৯ সালের ১ এপ্রিল বাহাদুর শাহ্ জাফরকে রেঙ্গুনে নিয়ে যাওয়া হয়। রেঙ্গুনের মাটিতে বন্দি সম্রাট পা দেওয়ার তিন সপ্তাহ বাদে পৌঁছন শ্বে ড্রাগন প্যাগোডায়। একটি কাঠের বাড়ি জাফরের কারাগার হিসাবে ইংরেজরা আগেই স্থির করে রেখেছিল এবং প্রধান কারারক্ষী হিসাবে দায়িত্ব পান ক্যাপ্টেন নেলসন ডেভিস (ডেল, পৃষ্ঠা ৪৬৫); রাত্রে ৩ জন এবং দিনের বেলা ২জন রক্ষী বাইরে মোতায়েন করা হত। প্রতিদিন দুবার করে বন্দিদের প্রতি সতর্কতামূলক পরিদর্শন চলত, সম্রাট ছিলেন কবি ও লেখক, কিন্তু প্রথম দিকে ইংরেজরা কালি, কলম বা কাগজ কিছুই সরবরাহের অনুমতি দেয়নি, পাছে তিনি গোপনে চিঠি পাঠান।

প্রথম দিকে বন্দি সম্রাট খুবই মনমরা হয়ে থাকতেন, কথা বলতেন খুবই কম, তাঁর বাসস্থান থেকে দেখা যেত সমুদ্র, বারান্দায় বসে বসে অপলক দৃষ্টিতে জাহাজের যাওয়া-আসা দেখতেন, হয়তো স্মৃতি রোমন্থন করতেন, প্রিয় জন্মভূমি হিন্দুস্থানের কথা ভাবতেন। সেই সময় মন খারাপ হলেও শরীর মোটামুটি ঠিকই ছিল, কিন্তু কয়েক বছর বাদে শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে, ১৮৬২ সালে বন্দি সম্রাটের বয়স ছিল ৮৭ বছর। হঠাৎ যেন তিনি দুর্বল হয়ে পড়লেন। তাঁর 'জিহ্বামূল পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হল (ডেল, ৪৭৩ পৃষ্ঠা)। ১৮৬২ সালের অক্টোবরে, বর্ষার শেষে সম্রাটের অবস্থা আরও খারাপ হল। তিনি খাবার গিলতে পারছিলেন না, তরল খাবার চামচে করে খাইয়ে দিতে হত। ৩ নভেম্বর অবস্থার আরও অবনতি হল। সম্রাটের নিরাপত্তা আধিকারিক ক্যাপ্টেন নেলসন ডেভিস লিখেছেন, 'সাধারণ শল্য চিকিৎসক মনে করেন না যে জাফর আর বেশি দিন বেঁচে থাকবেন।' পরদিন ডেভিস প্রতিবেদনে জানিয়েছেন, 'বৃদ্ধ মানুষটি ভগ্নদশায় পৌঁছেছে, সম্পূর্ণ গলা' পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছে। ডেভিস বুঝতে পেরেছিলেন বন্দি আর বেশিক্ষণ বাঁচবেন না, তিনি সমাধিস্থ করার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন ইট, চুন ইত্যাদি মজুত করার নির্দেশ দিলেন এবং সমাধি দেওয়ার জন্য বাছাই করা হল একটি নির্জন, গোপন জায়গা।

দীর্ঘ সময় নিদারুণ কষ্ট সহ্যের পর সমস্ত জীবনী শক্তি নিঃশেষ হল ১৮৬২

সালের ৭ নভেম্বর, ১৮৬২ ভোর ঠিক পাঁচটায়। হিন্দুস্থানের শেষ মোগল সম্রাট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন স্বদেশের বাইরে রেঙ্গুনে। শেষ হল ৩৫০ বছরের মোগল খানদানের ধারাবাহিকতা। ওই দিন বিকাল ৪টের সময় জাফরকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। সমাধি দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন জাফরের দুই পুত্র শাহ্জাদা জওয়ান বখ্ত ও শাহ্জাদা শাহ্ আব্বাস এবং কয়েজন পুরুষ পরিচারক মাত্র। মুসলিম রীতি অনুযায়ী কোনও মহিলাকে সমাধিস্থ করবার সময় যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। সমাধির চারদিকে তৈরি হয়নি কোনও স্থায়ী স্থাপত্য, স্রেফ কিছু দূর অন্তর বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছিল, তার কারণও ছিল। ডেভিস লিখেছেন, 'কিছুদিনের মধ্যে বৃষ্টি ও জলে বাঁশের বেড়া পচে নষ্ট হবে, সমাধির উপর গজিয়ে উঠবে সবুজ ঘাস, আগাছায় ঢেকে দেবে জাফরের সমাধি। এমন কোনও চিহ্ন থাকবে না যাতে কেউ বুঝতে পারে, ওখানে মাটির নীচে চিরনিদ্রায় রয়েছেন হিন্দুস্থানের সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর।'

ওই এলাকার লোকজন জানতেন কাঠের ওই বাড়িটিতে একদা হিন্দুস্থানের বাদশাহ্ কে ইংরেজরা বন্দি করে রেখেছিলেন। সেদিন বিকালে তারা দেখলেন বাড়িটির প্রাঙ্গনের মধ্যে যেন কিছু একটা হচ্ছে, প্রায় দুই শতাধিক মানুষ একত্রিত হয়েছিল বাড়ির বাইরে, কিন্তু তাদের ভিতরে প্রবেশাধিকার ছিল না।

ভারতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম সর্বাত্মক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সিরাজউদ্দিন বাহাদুর শাহ্ জাফর, কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষ তাঁকে উপযুক্ত মর্যাদা কি দিয়েছে? বা দেয়? লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা তোলা হয়, প্রধান মন্ত্রীজি ভাষণ দেন, সেদিনের বৃদ্ধ বাদশাহের কথা কি একবারও আমাদের মনে পড়ে? স্বাধীনতার পর অনেক রাজপরিবার, নবাব পরিবার সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ পদেও ছিলেন এবং আছেন, কেউ কেউ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছেন, তাঁদের পরিবার ১৮৫৭ সালের এই সংঘর্ষপূর্ণ দিনগুলিতে হিন্দুস্থানের সিপাহিদের পাশে দাঁড়ায়নি, সম্রাট বাহাদরশাহ্ জাফরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইংরেজদের বিরদ্ধে অস্ত্র তো ধরেই নি বরং সর্বাত্মক ভাবে ইংরেজদের সাহায্য করে ছিল, আজ তাঁরা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। বাহাদুর শাহ্ জাফর জানতেন তাঁর সীমিত ক্ষমতা ও সামর্থের কথা, তবুও তিনি সিপাহিদের ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন নি। হুমায়ুনের স্মৃতি সৌধ থেকে বেরিয়ে আসার পর ইংরেজ সেনাপতি তাঁকে গ্রেপ্তার করার প্রাক্কালে পরিহাসছলে উর্দুতে বলে ওঠেন—

'দম দমে মেঁ দেম আহীন খায়ির মাংগো কি
অই জাফর টৈনডী হুই শামসির হিন্দুস্থান কি।'
(ভারত এখন জড়, শ্বাস প্রশ্বাস বিহীন
এখন আপনার একমাত্র করণীয় প্রাণ ভিক্ষা চাওয়া,
ওহে জাফর, হিন্দুস্থানের তরবারি এখন ভগ্নপ্রাপ্ত।)

ব্যাঙ্গাত্মাক কবিতকি শুনে কাব সম্রাট জবাব দিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে, সে কবিতা যেন তাঁর মুখেই ছিল;

'গাজিয়ো মেঁ যব তক বাকি হ্যায় লৌ ইমান কী।
তব তো লন্ডন তক চলেগী তেগ হিন্দুস্থান কি।
(দেশ ভক্তদের মনে যত দিন দেশপ্রেম সুদৃঢ় থাকবে,
ততদিন লন্ডন পর্যন্ত ভারতীয়দের শক্তি ধাবিত হওয়ার আশা থাকবে।)

১৯৮৭ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বর্মা সফরে গিয়ে বাহাদুরশাহের সমাধিতে শ্রাদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। হিন্দুস্থানের সম্রাটের সমাধির জন্য সামান্য জায়গা হিন্দুস্থানে না মেলায় তিনি আক্ষেপ করেন। দুর্ভাগ্য তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সুদূর বিদেশি বার্মায়। মৃত্যুর আগে বাহাদুর শাহ্ এক কবিতায় সেই যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেছিলেন, সম্রাটের আক্ষেপ ছিল তাঁর সমাধি তাঁর প্রিয় হিন্দুস্থানের মাটিতে না হওয়ার জন্য, কাঠের বাংলোয় বন্দি সম্রাট স্বপ্ন দেখতেন, স্মৃতিচারণ করতেন তাঁর প্রিয় জন্মভূমি হিন্দুস্থানের। সেই কবিতার রেশ টেনে রাজীব গান্ধী বলেছিলেন—

'দোগজ জমিন তো না মিলি হিন্দুস্থান মে
ফির তেরি কুরবানি সে উঠি আজাদি কি আওয়াজ
বদ নসিব তু নেহি জাফর,
জুড়া হ্যায় তেরা নাম ভারত কি শান আউর শওকত মে
আজাদি কি পয়গাম সে।'

(একথা ঠিক হিন্দুস্থানের মাটিতে দুই গজ জমি মেলেনি, কিন্তু আপনার আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে উঠেছিল স্বাধীনতার আওয়াজ। হে জাফর আপনি আদৌ ভাগ্যহীন নন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সঙ্গে আপনার নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে একাত্ম হয়ে গিয়েছে।)

'ড, জিওয়াকা রোড; ড্যাগন; ইয়াঙ্গন, মায়ানমার' নামাঙ্কিত ঠিকানায় শায়িত আছেন শেষ মোগল বাদশাহ্ বাহাদুর শাহ্ জাফর। ১৯ মে, ২০১২ সস্ত্রীক

প্রধানমন্ত্রী ড. মনোমোহন সিংহ শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করেন বাহাদুর শাহ জাফরের সমাধি সৌধে। ২০১৭ সালে সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও শেষ মোগলবাদশাহ বাহাদুর শাহের স্মৃতি সৌধে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পন করেছেন।

১.২. বেগম জিনাত মহল এবং বাদশাহের পরিবার।

বাহাদুর শাহ্ জাফরের সঙ্গে তাঁর কনিষ্ঠা পত্নী সুন্দরী নিজাত মহলকেও বন্দি করেছিল ইংরেজরা। ১৮৩৭ সালে বাহাদুর শাহ্ জাফর যখন মসনদে বসেছিলেন তখন তাঁর প্রধান পত্নী ছিলেন তাজমহল বেগম, দরবারের এক সংগীত শিল্পীর অতূলনীয়া সুন্দরী কন্যা ছিলেন তিনি। মসনদে বসবার সময় জাফরের বয়স ছিল ৬২ বছর। মসনদে বসবার তিন বছর বাদে অর্থাৎ ৬৪ বছর বয়সে তিনি ১৯ বছরের সুন্দরী বেগম জিনাত মহলকে বিবাহ করেন। সেই সময় থেকে ক্ষমতার কেন্দ্র বিন্দু হতে তাজমহল বেগম দ্রুতগতিতে সরে যেতে থাকেন এবং সেই স্থান গ্রহণ করেন জিনাত মহল। বাহাদুর শাহ জাফরের মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনিই ছিলেন প্রিয়তমা পত্নী। কিন্তু তাই বলে জিনাত মহল যে বাহাদুর শাহ জাফর কে ভীষণভাবে সবকিছুতে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন তা নয়, বিশেষ করে নারীসঙ্গলাভ ছিল সম্রাটের অন্যতম বাসনা। জিনাত মহলের বিবাহের পরও 'তরুণ' বাদশাহ আরও চারটি বিবাহ করেন সব মিলিয়ে বাদশাহের শয্যা সঙ্গিনী ছিলেন পত্নী ও উপপত্নী মিলে ৬০ (ষাট) জন। তবে তাদের মধ্যে চারজন ছিলেন শাহি খানদান থেকে আগত, বাকি পত্নীরা ছিলেন আপেক্ষাকৃত নিম্ন পদমর্যাদা ভুক্ত পরিবারের এবং অনেকেই উপপত্নী হিসাবে ছিলেন।

বাদশাহ-ই হিন্দ সিরাজউদ্দিন আবুল মুজাফ্ফর মুহম্মদ বাহাদুর শাহ জাফরের বয়স যখন প্রায় ৮৩ বছর, পুত্রের সংখ্যা ১৬ জন এবং কন্যার সংখ্যা ৩১ (ভিন্নমতে ৩২) জন। ১৬ জন পুত্রের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের নাম জানা যায়।

৩১ জন (মতান্তরে ৩২) কন্যার মধ্যে মাত্র কয়েকজনের নাম জানা যায়, তাঁরা যথাক্রমে— রাবেয়া বেগম, বেগম ফতিমা সুলতান, কুলসুম জমানি বেগম, রৌণক জমানি বেগম (সম্ভবত ইনি বাহাদুর শাহ জাফরের নাতনি, জওয়ান বখ্তের কন্যা তথা জামশেদ বখতের ভগিনী)

অবশিষ্ট পুত্র কন্যারা হারিয়ে গিয়েছেন ইতিহাসের পাতা থেকে। সিপাহি বিদ্রোহকে কড়া হাতে দমন করবার জন্য ইংরেজরা নির্বিচারে যে গণহত্যা চালিয়ে ছিল তার মধ্যে মোগল বংশের শতাধিক নারী-পুরুষ ছিল। ১৮ জন

শাহ্জাদাকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। এই গণহত্যার নেতৃত্ব দেন সেনাপতি হাডসন।

১.৩. রক্তাক্ত দিনগুলি।

বাহাদুর শাহজাফর জানতেন তাঁর শক্তি, তাঁর ক্ষমতা, তিনি বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিতে চান নি, কিন্তু শেষে একরকম তাঁকে বাধ্য করানো হয়েছিল। বিদ্রোহী সেনাদের পক্ষে লোকবলের অভাব ছিল না, ছিল অর্থ আর যোগ্য নেতৃত্বের, অভাব ছিল স্বার্থ শূন্য ব্যক্তিত্বের। তারা বিভিন্ন সেনা শিবির থেকে এসেছিল কিন্তু নিজেদের অস্তিত্ব আলাদা ভাবে বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর ছিল, পরস্পরের প্রতি ছিল ঈর্ষান্বিত, একজন আর একজনের নেতৃত্ব মানতে চাইত না।

আফগান সেনাপতি বখ্ত খান ওই রকম ঈর্ষার ষড়যন্ত্রে পড়ে ব্যর্থ হন। ইংরেজরা একসময় যুদ্ধে সাফল্য নিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিল, তাদের মনে শঙ্কা ছিল তারা হেরে যাবে। শেষ পর্যন্ত উৎকোচ ছড়িয়ে ইংরেজরা বিদ্রোহীদের অনেককে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসে, সেইরকম একজন বিশ্বাসঘাতক ছিল হাকিম আসানুল্লা খান। বিদ্রোহীদের যাবতীয় গোপন সংবাদ নিয়মিত ইংরেজ শিবিরে সরবরাহ করা এবং বাহাদুর শাহ জাফরকে বিপথে চালিত করাই ছিল তার কাজ। আর এক বিশ্বাসঘাতক ছিল মির্জা ইলাহি বক্স, ইংরেজ সেনাপতি হাডসনকে সেই জানায় যে হুমায়ুনের স্মৃতি সৌধে লুকিয়ে আছেন বাহাদুর শাহ জাফর।

মির্জা ইলাহি বক্স এবং মৌলবি রজব অলিসহ এক ঝাঁক শিখ যোদ্ধা নিয়ে হুমায়ুনের স্মৃতি সৌধ থেকে বন্দি করা হয় শেষ মোগল বাদশাহ্কে, হাডসন কথা দিয়েছিলেন তাঁদের হত্যা করা হবে না। শিখ সৈন্যদের দলনায়ক ছিলেন সর্দার মান সিংহ।

বাহাদুর শাহ জাফরের সঙ্গে হুমায়ুনের সমাধিসৌধে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনজন শাহ্জাদা, মির্জা মোগল (মুঘল), খিজর্ সুলতান এবং আবুবক্র।

মির্জা ফকরুর পুত্র ছিলেন মির্জা আবু বক্র, তিনি বাহাদুর শাহ জাফরের পৌত্র, পুত্র মির্জা ফকরুর ছেলে। যে বিশ্বাসঘাতক মির্জা ইলাহি বক্স ইংরেজদেরকে বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন, তিনি জানিয়েছিলেন পুত্র-পৌত্রসহ বাদশাহ্ হুমায়ুনের স্মৃতি সৌধে লুকিয়ে আছেন, সেই ইলাহি বক্সের কন্যার সঙ্গে বিবাহ হয় শাহ্জাদা মির্জা ফকরুর, তাঁরই পুত্র আবু বকর, অর্থাৎ মির্জা ইলাহি বক্সের দৌহিত্র আবু বক্র। বলাবাহুল্য তাঁর মাতামহ তাঁরই সঙ্গে বেইমানি করলেন।

দুই পুত্র ও এক পৌত্রকে নিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন বাহাদুর শাহ্ জাফর। পুত্রদ্বয় যথাক্রমে মির্জা মুঘল এবং খিজর সুলতান এবং পৌত্র আবুবক্‌র। বাহাদুরশাহ্ জাফরের সঙ্গে তাঁর সেই সময় তাঁর প্রিয়তমা পত্নী জিনাত মহল এবং তাঁর কিশোর পুত্র জওয়ান বখ্‌ত ছিলেন না। সপুত্র জিনাত মহল ছিলেন তাঁর অসাধারণ 'লাল কুঁয়া' হাবেলীতে। ইংরেজরা তাঁদের দুজনকেও বন্দি করেছিল। বাহাদুর শাহ্ জাফরকে বন্দিবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বেগম জিনাত মহলের হাবেলীতে। চূড়ান্ত অবমাননাকর অবস্থার মধ্যে দিয়ে তিন শাহ্‌জাদা, বাহাদুর শাহ্ জাফর ও অন্যান্যদের গরুর গাড়িতে বসিয়ে প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। প্রতিটি গাড়ির দুই পাশে পাঁচজন করে সশস্ত্র রক্ষী যাচ্ছিল, তাদের উপর হাডসন ও অন্যান্য ইংরেজদের নির্দেশ ছিল যদি জনগণ বন্দিদের ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে তৎক্ষণাৎ যেন বন্দিদের গুলি করে হত্যা করা হয়। হাডসন বাহাদুর শাহ্ জাফরকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়ায় তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাঁর উপরে খুশি ছিল না। তাছাড়া হাডসন নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছিল বন্দি বাদশাহকে, অন্যদের নয়। হাজার হাজার দিল্লিবাসী মোগল খানদানের দুর্দশা দেখতে ভিড় করেছিল রাস্তার দুই পাশে, ফলে হাডসন ও অন্যদের কিছুটা আশঙ্কা ছিল।

স্বয়ং হাডসন ১০০ জন সৈন্য নিয়ে যাচ্ছিল, ছিল সেনাপতি উইলসন, ম্যাকডোয়েল প্রমুখ। সমস্ত বন্দিদের নিয়ে গাড়ির মিছিল যাচ্ছিল দিল্লি কেল্লার দিকে, কেল্লার প্রাচীরের কাছাকাছি 'খুনি দরওয়াজা'র কাছে পৌঁছল তারা। সেখানে অপেক্ষা করছিল এক বিরাট সংখ্যক দিল্লিবাসী, দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল তারা বুঝি শাহ্‌জাদা ও বাদশাহকে ছিনিয়ে নিতে প্রস্তুত হয়েছে। যে আশঙ্কার কথা হাডসনও অন্যান্যরা মাথায় রেখেছিল। আসলে ওসব ভাবনা উপস্থিত জনতার মনে ছিলই না, খোদ ম্যাকডোয়েল পরে লিখেছিলেন, লোকজনের সংখ্যা যে খুব বেশি ছিল তা নয়, আর তারা যে বন্দিদের উদ্ধার করতে সমবেত হয়েছিল তাও নয়। কিন্তু হাডসন জনতাকে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, গাড়ি থামাতে নির্দেশ দেওয়া হল। তিনি শাহ্‌জাদাকে গাড়ি থেকে নামতে বলল হাডসন। তিনজনকে প্রকাশ্য রাজপথে নগ্ন করা হল। নিজের কোল্ট (Colt) রিভলবার বার করে ঠাণ্ডা মাথায় তিনজনকে হত্যা করল হাডসন, হত্যা করল খুব কাছ থেকে গুলি করে। মৃতদের শরীর থেকে হাডসন খুলে নিল 'বাজুবন্দ', রত্নবিহীন তরবারি ও অন্যান্য জিনিসপত্র, সেগুলো সে নিজের জিম্মায় রাখল।

ওই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে নিষ্ঠুর বর্ণনা দিয়েছেন Holmes তাঁর Indian Mutiny

(চতুর্থ সংস্করণ) গ্রন্থে এবং Mallesson তাঁর Indian Mutiny ১৮৭৯ সালের সংস্করণে। Holmes এর ভাষায় :

'হাডসন এমন একজন মানুষ যার মধ্যে ছিল না সামান্যতম নীতি জ্ঞান, ছিল না ভয়। যেভাবে তাদের হত্যা করা হয়েছিল তা ছিল সবরকম মানবিকতার বিরূদ্ধাচরণ। সে ছিল চূড়ান্ত অপরাধী (পৃষ্ঠা ৩৭২, ৩৭৭)।'

Mallson লিখেছেন :

'মে মাসে ইউরোপীয় হত্যা বিষয়ে ওই শাহ্জাদাগণ যে কাউকে প্ররোচিত করেছিলেন সে বিষয়ে একটি প্রমাণও মেলেনি। হাডসনের মনে জেগে উঠেছিল নিষ্ঠুরতা এবং অপ্রয়োজনীয় তীব্র হিংস্রভাব [৭০, ৮০ পৃষ্ঠা]।'

গুলি করবার আগে শাহ্জাদাগণ অসহায়ভাবে হাডসনের কাছে প্রাণভিক্ষা করেন, কাতরভাবে অনুরোধ করেন 'তহ্কিক' বা অনুসন্ধান করার জন্য। তাদের ব্যবহার, অতীতের কার্যকলাপ, আচরণ সম্বন্ধে তদন্ত করতে কাতর স্বরে অনুনয় বিনয় করেন। হাডসন কিছুই শোনেনি। প্রথম পর্যায়ে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল ১৮ জন, এবার গুলি করে মারা হল তিনজনকে। ২১ জন মোগল শাহ্জাদার অকাল মৃত্যু ঘটল।

তিনটি নগ্ন মৃতদেহকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল 'কোতোয়ালি'র সামনে [ডেল: ৩৯৮]। ওই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী চার্লস জন গ্রিফিট্স The Seige of Delhi গ্রন্থে লিখেছেন (পৃষ্ঠা১৬) : 'বড় শাহজাদা মির্জা মুঘল পূর্ণতা পেয়েছিল, বরং তুলনামূলকভাবে খিজ্র সুলতান একটু ছোটো, আর তৃতীয় আবুবক্র তো নিতান্তই ছোটো, তাঁর বয়স কুড়ির বেশি হবে না। প্রত্যেক শাহ্জাদার হৃদপিণ্ডে দুটি করে গুলি লেগেছিল, ছিল বুলেট দ্বারা ছিন্ন হওয়া দুটো করে গর্ত, মাংসে বারুদ লেগেছিল, কারণ খুব কাছ থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল।... তিন দিন যাবৎ এইভাবে অন্যান্য মৃতদেহের স্তূপের উপর পড়ে রইল তাদের দেহগুলো, তারপর অসম্মানজনকভাবে তাদের সমাধিস্থ করা হয়।'

১.৪. মির্জা খোয়ায়েশ (কুয়াইশ)।

২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিস্থিত হুমায়ুনের সমাধিসৌধ থেকে বন্দি করা হয়েছিল শেষ মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহ্ জাফরকে। লাহৌর দরওয়াজা দিয়ে বন্দিবাদশাহের পালকি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, পাশে ছিল একাধিক সশস্ত্র নিরাপত্তা রক্ষী। চাঁদনি চক দিয়ে বাহাদুরশাহ জাফরের পালকি প্রবেশ করল দিল্লির লাল কেল্লায় বন্দি হিসাবে।

হাডসন ভেবেছিল সে বাদশাহ্‌কে বন্দি করায় প্রধান সেনাপতি উইলসন বোধ হয় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, কিন্তু তিনি বরং হাডসনের উপর বিরক্ত হয়েছিলেন। উইলসন বলেছিলেন :

'আমি খুশি হয়েছি, বিশেষ করে সম্রাট কে বন্দি করার সংবাদ পেয়ে। কিন্তু আমি তোমার মুখ দ্বিতীয়বার দেখতে চাই না।'

ওই কথাবার্তার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন ফ্রেড মেইজি, তাঁর ভাষায় : *'বয়স্ক সেনাপতি উইলসন হাডসনের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ ছিলেন, কারণ সে বাহাদুর শাহ জাফরকে জীবন্ত উপস্থিত করেছিল।'*

অক্টোবর-নভেম্বর মাস ধরে গোটা দিল্লি তন্ন তন্ন করে ইংরেজ সৈন্য, ইংরেজ গুপ্তচরেরা খুঁজতে লাগল কোথায় মোগল খানদানেরা লুকিয়ে আছে, খুঁজে পেলেই হত্যা। বাহাদুর শাহ জাফরের দুই নির্দোষ কিশোর পুত্রকে এক গোপন আস্তানা থেকে বন্দি করে ইংরেজরা, মির্জা বখ্‌তওয়ার শাহ্‌, বয়স আঠারো এবং মির্জা মিঞাঁদো, বয়স মাত্র সতেরো। তাঁদেরকে তুলে দেওয়া হল মেজর হারিয়টের তত্ত্বাবধানে এবং দুই নির্দোষ কিশোরকে হত্যা করা হল, বাহাদুর শাহ জাফর তথা মোগল বংশধরদের আরও দুজন বিদায় নিল এই দুনিয়া থেকে।

তাঁদের হত্যা বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী ওমানি তাঁর রোজ নামচার ১২ অক্টোবর, ১৮৫৭ তারিখে লিখেছেন :

'আগামী কাল এই দুই বন্দিকে হত্যা করা হবে। আমি তাঁদের সঙ্গেই ছিলাম। আমার মনে হয় না আগামী কাল কী হতে যাচ্ছে এ বিষয়ে তাঁরা আদৌ জানে, তাঁরা শুধুমাত্র তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের দেখতে চাইছিল। আমি মির্জা মিঞাঁদো'র দুজন পত্নী ও এক সন্তানকে নিয়ে গেলাম বন্দির কাছে। কয়েক মিনিট তাঁরা তাঁদের স্বামী এবং পিতাকে দেখলেন।... পরদিন গরুর গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হল বধ্যভূমিতে, পিছনে পিছনে চলল গোলন্দাজ সৈন্যরা। প্রাসাদের পিছনে বালুকাময় জমিতে তাদের হত্যাক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। গাড়ি থেকে বন্দিদের নামিয়ে চোখ বাঁধা হল, ১২ পা দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল ১২ জন বন্দুকধারী। তাঁরা নির্দেশ পেয়েই গুলি ছুঁড়ল (ডেল : ৪২২-৪২৩)।'

ইচ্ছাকৃতভাবে গুর্খা সৈনিকেরা শরীরের অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গায় গুলি ছুঁড়েছিল যাতে মৃত্যু অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক হয়, দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সবার শেষে পিস্তলের গুলি চালিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করে। গ্রিফিট্‌স লিখেছেন, *'এর*

চেয়ে মর্মান্তিক আচরণ আর কী হতে পারে অসহায় বন্দিদের সঙ্গে যা করা হয়েছিল? নিঃশব্দে নীরবে তাদের ভাগ্য কে মেনে নিতে বাধ্য হল, তারা...। Seige of Delhi : Griffiths, পৃষ্ঠা ২১৪, ১৩ অক্টোবরের লেখা]'

বাহাদুর শাহ্ জাফরের অধিকাংশ পুত্র ও পৌত্রদের ভাগ্যে একই ঘটনা ঘটতে লাগল, মৃত্যুদণ্ড! ইংরেজরা স্থির করেছিল একজন মোগল বংশধরকেও তারা জীবিতাবস্থায় রাখবে না। সিপাহি বিদ্রোহের আগুন জ্বলবার আগে বিদ্রোহীরা কয়েকজন ইংরেজদের হত্যা করে, তাদের মধ্যে ছিল নারী ও শিশুও, সেই রাগে ইংরেজরা ফুটছিল। কিন্তু তাতে বাহাদুর শাহ জাফর বা তাঁর পুত্র ও পৌত্রদের না ছিল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা বা সামান্যতম ইন্ধন, বরং অনেক ইংরেজ নারী ও শিশুকে কেল্লায় নিয়ে এসে বাহাদুর শাহ জাফর আশ্রয় দেন, খাদ্য পাণীয় সরবরাহ করেন। বিদ্রোহীরা তাদের হত্যা করতে চাইলে তিনি বাধা দেন। ইসলামীয় অনুশাসন অনুযায়ী ওই কাজ যে অনুচিত তা তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। কিন্তু ইংরেজরা সে সব কৃতজ্ঞতাবোধকে যমুনার জলে ভাসিয়ে মোগল বংশধরদের হত্যালীলায় মেতে উঠল, একজন মোগল বংশধরও যেন বেঁচে না থাকে। মেজর উইলিয়াম আয়ারল্যাণ্ড লিখেছেন (পৃষ্ঠা ২৮০) :

'পালিয়ে বাঁচবার যতরকম সুযোগ ছিল তারা তা চেষ্টা করল। তবুও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে শেষ পর্যন্ত অনেককে বন্দি করা হল। মোগল বংশধর হিসাবে ২৯ জনকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হল [A History of Seige of Delhi : Major William Ireland] ।'

যাদের হত্যা করা হয়েছিল তারা সবাই যে বাহাদুর শাহ্ জাফরের পুত্র বা পৌত্র ছিলেন তা নয়, যতদূর নানা যায় বাহাদুর শাহ্ জাফরের দুই পুত্র পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। যে সময়ে মির্জা বখ্তওয়ার শাহ এবং মির্জা মিঞাঁদোকে বন্দি করা হয়েছিল, একই সময়ে দুই পুত্র মিত্রা আবদুল্লা এবং মির্জা খোয়ায়েশ কে রাখা হয়েছিল হুমায়ুনের স্মৃতি সৌধে। তাঁরা যে বাঁচবেন এরকম কোনও আশা ছিল না। তাঁদের নিরাপত্তার ভার দেওয়া হয়েছিল একজন শিখ সৈনিকের উপর। দিল্লিবাসীর মুখে মুখে যে কথা প্রচলিত ছিল তার উপর ভিত্তি করে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উর্দু লেখক আরশ তৈমুরি যা লিখেছিলেন তা নিম্নরূপ :

দুটি কিশোরকে দেখে শিখ রিসালদারের মনে দয়া হল,
তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন :
'তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন?'

তারা প্রত্যুত্তর দিল :

'সাহেব তো এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন।'

কটমট করে তাদের দিকে তাকিয়ে শিখ সৈনিক বলে উঠলেন : তোমাদের প্রাণের মায়া আছে? তোমরা কি বাঁচতে চাও? সাহেব ফিরলেই তোমাদের হত্যা করবে। যে দিকে পারো পালাও, পালিয়ে বাঁচো। আর মনে রেখো, একদম থামবে না, দম নেওয়ার জন্যও থামবে না। যাও, দৌড়ও।' [ডেলরেম্পল : ৪২৩]।

বলেই শিখ রিসালদার অন্যদিকে মুখঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। দুই শাহাজাদা দৌড়লেন আলাদা পথে। বেশ কিছুক্ষণ বাদে হাডসন ফিরে এসে দেখল বন্দিরা উধাও। সে রিসালদার কে জিজ্ঞাসা করলে : 'ওই দুজন কোথায়?'

'কোন দুজন? রিসালদার এমনভাব করলেন যেন কিছুই জানেন না, নিষ্পাপ, সহজ, সরল মনে তিনি হাডসনের কাছে জানতে চাইলেন। 'যে দুজন শাহ্জাদা এখানে দাঁড়িয়ে ছিল,' উত্তেজিত হাডসন বললেন। শিখ সৈনিক নির্বিকারে জবাব দিলেন, 'কোন্ দুজন শাহ্জাদা? কই আমি তো কিছুই জানি না।' [ডেল : ৪২৩]

বেঁচে গেলেন দুই শাহ্জাদা। মির্জা খোয়ায়েশ সোজা গিয়ে উঠলেন তাঁর ভগ্নিপতি [অথবা শ্যালক] নিজাম উদ্দিনের কাছে, গিয়ে জানালেন তিনি হাডসনের কবল থেকে পালিয়ে এসেছেন। কিন্তু নিজাম উদ্দিন মোগল শাহ্জাদা কে আশ্রয় দিলেন না, বা বলা ভাল আশ্রয় দিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনতে চাইলেন না।

তিনি সোজাসাপ্টা জানালেন, 'দাদা, এখান থেকে পালান।' অগত্যা খোয়ায়েশ নিজাম উদ্দিনের গৃহ পরিত্যাগ করলেন, কিন্তু যাবেন কোথায়। যাবেনই বা কীভাবে? সর্বত্র হাডসনের চরেরা তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। নিজের অবয়ব ঢাকবার জন্য প্রথমে মাথা নেড়া করলেন, তারপর একটা কাপড় বেঁধে নিলেন নেড়া মাথায়। লজ্জা নিবারণের জন্য ও হাডসনের চোখে ধুলে দেওয়ার জন্য পরলেন কটিবস্ত্র বা কৌপিন, যেন কোনও হিন্দু সন্ন্যাসী বা ফকির চলেছেন। কেউ সন্দেহ করল না মির্জা খোয়ায়েশকে। কিন্তু কোথায় আশ্রয় নেবেন তিনি? মনে পড়ল রাজপুতানার উদয়পুরের কথা। উদয়পুর রাজপরিবারের সঙ্গে বাহাদুর শাহ জাফরের সখ্যতা ছিল, এই দুর্দিনে তিনি কি এতটুকু সাহায্য করবেন না? [ডেল : ৪২৪]।

উদয়পুরে গিয়ে খোয়ায়েশ দেখা করলেন মহারাজার কয়েকজন খোজার সঙ্গে, তারাও দিল্লি থেকে এসেছিল। খোজারা মহারাজার কাছে জানালেন যে

একজন দরবিশ এসেছেন, কিছু সাহায্যের প্রত্যাশায় আছেন। যদি একটা নির্দিষ্ট অর্থ তাঁর জন্য বরাদ্দ করা হয় তা হলে তিনি উদয়পুরে থাকতে পারবেন, আর আপনার মঙ্গল কামনায় অবশিষ্ট জীবনটা কাটাবেন।

মহারাজা ওই আবেদন মঞ্জুর করলেন, ঠিক হল প্রতিদিন দরবিশ দু টাকা হিসাবে ভাতা পাবেন। সিপাহি বিদ্রোহের পর টানা ৩২ টি বছর (১৮৮৯ খ্রি. পর্যন্ত) মির্জা খোয়ায়েশ ছদ্মবেশে উদয়পুরে ছিলেন। 'মিঞাঁ সাহিব' নামে সবাই তাঁকে চিনত।

এদিকে হাডসন চুপচাপ ছিল না। তার নাগাল থেকে 'শিকার' পালিয়েছে, তাকে একরকম বুদ্ধু বানিয়ে সে চলে গিয়েছিল, ভাবতেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠত। ক্রমাগত খোয়ায়েশের খোঁজে হাডসন চর লাগাল, প্রতিটি মহল্লা, পাড়া, গ্রামে গোপনে অনুসন্ধান চলতে লাগল। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না মির্জা খোয়ায়েশকে, মোগল জীবিত বংশধর মির্জা খোয়ায়েশকে যেভাবেই হোক হত্যা করতেই হবে। সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার টাঙানো হল, পুরস্কার ঘোষণা করা হল উচ্চমূল্যের।

এক সময় সংবাদ পাওয়া গেল উদয়পুরে এরকম একজনকে দেখা গিয়েছে। ঘটনার সঙ্গে সেই দরবিশের উদয়পুর আগমন মিলে যাচ্ছিল (মিলে যাওয়ারই তো কথা!) লোক পাঠানো হল সুদূর উদয়পুরে। উদয়পুর শহরের কোতোয়ালের সহায়তায় তারা পৌঁছল মির্জা খোয়ায়েশ তথা মিঞঁ সাহিবের গৃহে, যে গৃহে মোগল শাহজাদা ছদ্মবেশে বাস করতেন। কিন্তু সেখানে তাঁকে পাওয়া গেল না। তাঁকে ধরবার জন্য একাধিকবার ইংরেজরা চর পাঠিয়েও সফল হয়নি। সম্ভবত, ইংরেজরা নিশ্চিত হয়েছিল উদয়পুরের জনপ্রিয় মিঞা সাহিব'ই মোগল শাহজাদা মির্জা খোয়ায়েশ। উদয়পুরে মিঞাঁ সাহিবের জনপ্রিয়তাই সম্ভবত, তাঁকে বাঁচিয়েছিল, বারবার ইংরেজ রক্ষীদের আগমনের আগাম বার্তা তাঁর কাছে পৌঁছে যেত।

উদয়পুরেই বোধ হয় ১৮৮৯সালে তিনি মারা যান [তাঁর মৃত্যু বিষয়ে কোনও প্রমাণ্য নথি মেলে না।)।

১.৫. মির্জা আবদুল্লা ।

এবার দেখা যাক মির্জা খোয়ায়েশের সঙ্গে তাঁর অন্য যে হতভাগ্য ভাই মির্জা আবদুল্লা পালিয়েছিল, তার কী হল। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে মির্জা আবদুল্লা

পৌঁছন দেশিয় রাজ্য টঙ্কে (Tonk), সেখানকার রাজার বদান্যতায় তিনি ছিলেন, তবে নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন নি তিনিও। কোনও সময় স্রেফ দু মুঠো খাবারের জন্য তাঁকে ভিক্ষা করতে হয়েছিল!! মোগল শাহ্জাদাকে বাস্তব অর্থেই ভিক্ষুকের পেশা নিতে হয়েছিল, ঘুরতে হত পথে পথে! ইংরেজ চর তাঁকে খোঁজার জন্যও পিছনে ছিল, এক নিদারুণ, নির্দয় ও অবর্ণনীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন কাটত, শেষ পর্যন্ত ওইভাবেই তিনি মারা যান। তাঁর সম্বন্ধে ও বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না।

১.৬. বাদশাহ্ বাহাদুর শাহ জাফরের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত ।

২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭ বাহাদুর শাহ জাফরকে হুমায়ুনের স্মৃতি সৌধ থেকে বন্দি করা হয়েছিল। নিজস্ব প্রসাদ থেকে বন্দি করা হয়েছিল সপুত্র বেগম জিনাত মহলকে। বিভিন্ন টালবাহানার পর ইংরেজরা স্থির করল বন্দি বাদশাহের 'বিচার' করতে হবে। শেষ পর্যন্ত ২৭ জানুয়ারি, ১৮৫৮, আরম্ভ হ'ল বিচারপর্ব, বিচার তো নয়, বিচারের নামে প্রহসন নাটিকা, 'বিচার' 'বিচার' খেলা। কী শাস্তি তাঁকে দেওয়া হবে তা কিন্তু আগেই স্থির করা ছিল। সেই সময় বন্দি বাদশাহ খুবই অসুস্থ ছিলেন, তখন তাঁর বয়স ৮২ বছর ৩ মাস! বাদশাহের পক্ষে উকিল ছিলেন গুলাম আব্বাস, বিচার সভার সদস্যরা ছিলেন মেজর পামার, মেজর রেডমণ্ড, মেজর সইয়ার্স এবং ক্যাপ্টেন রথনি, প্রধান বিচারপতি ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ডয়েস। দোভাষী ছিলেন জেমস মারফি এবং সরকারি আইনজীবী ছিলেন মেজর এফ জে হারিয়ট। বোঝাই যাচ্ছে বিচার করা হয়েছিল সামরিক আদালতের নিয়ম অনুযায়ী যাকে সহজভাবে বলে 'কোর্ট-মার্শাল'। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান লিপিবদ্ধ করা হল, প্রাসাদ থেকে বাজেয়াপ্ত করা চিঠি, মির্জা মুঘল ও শহরের কোতোয়ালদের কাছ থেকে উদ্ধার করা নথি দরবারে পড়ে শোনানো হয়। প্রতিটি নথি বাহাদুর শাহ্ জাফরকে দেখানো হলে তাতে যে স্বাক্ষর ছিল সেগুলি তাঁর নয় বলে তিনি দৃঢ়তার সাথে জানান।

একমাত্র জীবিত পুত্র মির্জা জওয়ান বখ্ত কে বিচারালয়ে আসবার অনুমতি দেওয়া হয়নি (তখনও বাহাদুর শাহ্ জাফর জানতেন না মির্জা খোয়ায়েশ ও অন্যান্যদের ভাগ্যে কী জুটেছে)। এই কারণে বন্দি সম্রাট ওই বিচারকার্যে আগ্রহ হারিয়েছিলেন। প্রায় দুই মাস ধরে চলেছিল সেই 'বিচার বিচার খেলা'। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বাহাদুর শাহ জাফর দীর্ঘ্য বক্তব্য পেশ করেন, তাতে নিজেকে

নির্দোষ প্রমাণ করতে যুক্তি সাজান, তথ্য ও নথি পেশ করেন, যথেষ্ট আকর্ষণীয় ছিল সে বক্তব্য :

আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের জবাবে আমাকে প্রকৃত ঘটনা বলতে হবে এবং এই বৃদ্ধ বয়সে আমার মিথ্যা বলবার বাসনা নেই।

দিল্লিতে গোলমাল শুরুর আগে আমি সেরকম কিছুই জানতে পারিনি। সকাল ৮টা নাগাদ একদল বিক্ষুব্ধ যোদ্ধা আমার প্রাসাদের জানালার কাছে গোলমাল করতে থাকে এবং প্রকৃত কারণ জানবার জন্য আমি সেখানে যাই। তারা মিরাট থেকে এসেছিল বলে আমায় জানায়, তারা আরও বলে যে সেখানকার ইংরেজ সৈন্যদের হত্যা করেই তারা দিল্লিতে উপস্থিত হয়েছে, দিল্লিতে আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা জানায়— হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্ম নষ্ট করবার জন্য ইংরেজরা ইচ্ছা করে শুয়োর ও গরুর চর্বি দিয়ে প্রস্তুত টোটা দাঁতে ছিঁড়ে বন্দুকে ব্যবহার করতে তাদের বাধ্য করেছিল। প্রতিবাদ করায় অগুণতি হিন্দুস্তানি সৈনিককে হত্যা করা হয়েছে, তাই তারা বাধ্য হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। মিরাটের ইংরেজদের হত্যা করে তারা আমার কাছে এসেছিল। তারা জানায়, তারা একজন সর্বজন গ্রাহ্য হিন্দুস্থানি নেতাকে খুঁজছে, তারা আমায় বলে, 'আপনার শরীরে শাহি ঐতিহ্যবাহী রক্ত আছে, আপনি বয়সে প্রবীণ, আমরা এই কারণে সর্বসম্মত হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে চাই। আপনি হবেন গোটা হিন্দুস্থানের স্বাধীন বাদশাহ্। দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য আপনার নির্দেশ ও আদেশ মাথায় নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই। বিদেশি বণিকদের আমরা হিন্দুস্থান থেকে তাড়াব। এ দেশ আমাদের। হিন্দু-মুসলমানদের মিলিত চেষ্টায় দেশ আবার নতুন করে গড়ে উঠবে।

আমি তাদের বক্তব্য ও উদ্দেশ্য বুঝতে পারি। তাই তাদের কথা শেষ হওয়ার আগেই নিজের হাতে জানালা বন্ধ করে দিই। প্রাসাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা প্রধান আধিকারিকের কাছে আমি সংবাদ দিই। সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি উপস্থিত হন এবং বিদ্রোহী সৈন্যদের সঙ্গে কথা বলবার জন্য বাইরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন, আমি তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হলাম না। তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিক্ষুব্ধদের সাঙ্গে কথা বলতে চলে যান।

এই ঘটনার একটু পরেই আমি একটা চিঠি পেলাম মিষ্টার ফ্রেজারের কাছ থেকে। আত্মরক্ষার জন্য তিনি দুটো বন্দুক পাঠাতে অনুরোধ করেন।

ওই একই সময়ে প্রাসাদের নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর প্রধান আধিকারিক দুখানা পালকি চেয়ে আমার কাছে জরুরি চিঠি পাঠান, দুজন বিপন্ন নারীকে আমার প্রাসাদের নিরাপদ জায়গায় পাঠানো ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। চিঠি দুটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি উভয়ের অনুরোধ রক্ষা করি।

কিছুক্ষণ পর আমি জানতে পারলাম আমার পাঠানো বন্দুক ও পালকি নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছনোর আগেই মিষ্টার ফ্রেজার খুন হয়েছেন, খুন হয়েছেন প্রাসাদের নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর প্রধান আধিকারিক এবং সেই বিপন্ন মহিলা দুজন।

কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করবার আগেই দেখা গেল দলে দলে বিদ্রোহী সৈনিকেরা দিওয়ান-ই-খাস ও তার নিকটস্থ মসজিদে উপবিষ্ট হচ্ছে। আমি ভীত হয়ে পড়লাম নিজের এবং অন্যদের নিয়ে। কারণ প্রতিপক্ষদের প্রতি বিদ্রোহীরা কত নির্মম ও নিষ্ঠুর হতে পারে আমি তা জানতাম। দুই হাত জোড় করে আমি তাদেরকে বললাম—তোমরা দয়া করে বাদশাহি প্রাসাদের বাইরে চলে যাও। তারা কিছুতেই সম্মত হল না। আমি তখন বাধ্য হয়ে তাদেরকে প্রশ্ন করলাম, 'কী চাও তোমরা? তোমাদের মূল উদ্দেশ্য কী?'

তারা বলল, 'আমরা যা চাই এ পর্যন্ত তাই করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবেই। আপনি দয়া করে আমাদের কাজে বাধা দেবেন না।'

তাদের আচরণে আমি আরও বেশি ভয় পেলাম। আমি বিরোধিতা করবার সাহস পাই নি। বুঝলাম, নির্বাক দর্শকের ভূমিকা নিতে হবে, তা না হলে তাদের হাত থেকে আমিও নিস্তার পাবো না।

ওইদিন সন্ধ্যায় কয়েকজন ইংরেজকে বিদ্রোহীরা বন্দি করে আনলো। বারুদখানা থেকে তাদের বন্দি করা হয়েছে বলে জানানো হল। আমার সামনে তাদেরকে হত্যা করতে চাইলে আমি রাজি হলাম না। তাদেরকে হত্যা না করবার জন্য আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করলাম। আমার অনুরোধ বিদ্রোহী সৈন্যরা রাখল এবং তাদের হত্যা না করে সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

আমি দ্বিতীয় দিন জানতে পারলাম, বিদ্রোহীরা বন্দিদের হত্যা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে আমি সঙ্গে সঙ্গে নিজে তাদের কাছে গিয়ে হাত জোড় করে বন্দিদের প্রাণ ভিক্ষা চাইলাম। অনেক তর্ক, বিতর্ক ও আলোচনার পর এবারও তারা আমার অনুরোধ রক্ষা করল। এর পরে আমার অজান্তে হতভাগ্য লোকগুলিকে তারা হত্যা করে। আমাকে গোপন করেই তা করা হয়েছিল।

কিন্তু আজ আমি লক্ষ্য করেছি, বিস্মিত হচ্ছি সে সমস্ত হত্যার দায়ও চাপানো

হচ্ছে আমার উপর। আমার আদেশেই এমন নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হয়েছে বলে সরকারি 'প্রমাণ' পাওয়া যাচ্ছে, অনেকে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

অনেকে আবার মিষ্টার ফ্রেজার এবং প্রাসাদের নিরাপত্তারক্ষী বাহিণীর প্রধান আধিকারিককে হত্যার সঙ্গে আমার পরিচারকদের সহযোগিতা ছিল বলে দাবি করেছে। সে ব্যাপারেও আমার জবাব ওই একই তাদের হত্যার ব্যাপারে আমি কাউকে কোনও নির্দেশ বা আদেশ দিইনি। সাক্ষী মুকুন্দলাল কী করে এরকম একটা নির্ভেজাল অসত্য তথ্য ধর্মের নামে শপথ করে আমার বিরুদ্ধে বলল তা শুনে আমি বাকরুদ্ধ হচ্ছি।

এইভাবে আমার অজ্ঞাতে বিদ্রোহীগণ অনেক মূল্যবান জীবন শেষ করেছিল এবং সে কারণে তারা তিরস্কৃত হয়েছিল। আমার উপর এই সব কারণে তারা আস্থা হারায়। তাদের উদ্দেশ্য সফলের পথে আমি সবচেয়ে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। এই কারণেই বিদ্রোহীরা মির্জা মুঘল, মির্জা সুলতান ও মির্জা আবু বকর কে আমার সামনে উপস্থিত করে তাদের বিভিন্ন সৈন্য দলের সেনাপতি করবার দাবি জানিয়েছিল। প্রথমদিকে আমি তাদের প্রস্তাবে কোনও গুরুত্বই দিইনি। পুত্রদের সেনাপতি করার অর্থ আমাকেই সর্বাধিনায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। আমি তো আদৌ তা চাইছিলাম না। সৈন্যরা আমার নীরবতায় অসন্তুষ্ট হয়েছিল। তারা অনুমতি দেওয়ার জন্য জেদাজেদি করতে লাগল। তবু আমার সিদ্ধান্তে দৃঢ়তার সাথে আমি স্থির রইলাম।

আমার অসম্মতি সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা মির্জা মুঘলকে প্রধান সেনাপতি করে। তাদের দেওয়া নিয়োগ পত্রে দস্তখত করতে তারা আমায় বাধ্য করে।

প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক, আমার যখন সম্মত ছিল না ওই প্রস্তাবে, তা হলে আদেশনামা তে আমি স্বাক্ষর করলাম কেন? বাস্তবে আমাকে নজর বন্দি করে রাখা হয়েছিল, যদি আমি ওই নিয়োগপত্রে স্বাক্ষর না করতাম আমাকে হত্যা করাও তাদের পক্ষে কোনও কঠিন কাজ ছিল না।

এরকম অনেক বার পার হয়েছে তাদের তৈরি আদেশনামাতে আমি না পড়েই স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছি। অনেক সময় স্রেফ সাদা কাগজে আমাকে স্বাক্ষর করতে হয়েছে, স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছিলাম বাঁচবার তাগিদে। সে সব কাগজ তারা কোথায়, কোন পরিস্থিতিতে, কীভাবে কাজে লাগিয়েছে আমি তা কিছুই জানি না।

অনেক সময় আমার সম্মতি পাওয়ার জন্য অনেক শাহ্জাদাকে আমার কাছে

পাঠানো হত, কিন্তু তাদের সঙ্গে থাকত বন্দুকধারী সৈনিকেরা। আমাকে বাধ্য হয়ে প্রাণের মায়ায় সেই সব আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করতে হতো। দু একবার আপত্তি করায় মির্জা মুঘলের সামনেই হুমকি দেওয়া হয়েছিল। তারা শুধুমাত্র যে আমাকে সন্দেহ করত তা নয়, বেগম জিনাত মহল, আহ্সান উল্লাহ, মাহ্বুব আলির মতো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরও সন্দেহের তালিকায় রেখেছিল। অবস্থা এরকম হয়েছিল যে, বিদ্রোহীরা ক্ষেপে গিয়ে আহ্সান উল্লাহর মতো সম্মাননীয় ব্যক্তির বাড়ি লুঠ করে তাঁকে বন্দিবস্থায় নিয়ে এসেছিল। শুধু তাই নয় তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। আমার সকাতর আবেদনে শেষ পর্যন্ত নিরপাধ নিরীহ ব্যক্তিটির প্রাণ রক্ষা পায়। তবে আজও তিনি বন্দি রয়েছেন। তিনি আর মুক্তি পাননি, ঠিক যেমন আমার মুক্তি মেলেনি।

এমন মারাত্মক অবস্থা তৈরি হয়েছিল যে তারা আমাকে মসনদচ্যুত করে আমার পুত্র মির্জা মুঘলকে সিংহাসনে বসাবে বলে পরিকল্পনা করে। এমতাবস্থায় আমার পক্ষে তখন কী করা উচিত ছিল? অন্য কেউ যদি আমার অবস্থায় পড়তেন তিনিই বা কী করতেন। অবস্থার পরিস্থিতিতে তা হলে তার বিচারও আজ করতে হবে। সে বিচার না করলে তা হবে অবিচার।

বিদ্রোহী সৈনিকেরা একটা বিচার সভারও আয়োজন করেছিল। সেখানে আমার কোনও কর্তৃত্বই ছিল না। তারা তাদের ইচ্ছামতো বিচার প্রক্রিয়া সমাপ্ত করত। কোনওদিন সে বিচার সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম, মিথ্যা করেও কোনও সাক্ষী তা বলেনি। বলতে পারবেও না।

লুটতরাজ যখন আরম্ভ হল, আমি এতটাই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম যে, ফকিরের ছদ্মবেশে প্রথমে কুতুব সাহেবের দরগা, পরে আজমিড়ে, আরও পরে মক্কা শরিফে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম। যেভাবেই হোক আমার পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে বিদ্রোহী সৈন্যরা কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েন করে।

বারুদখানা ও কোষাগার লুণ্ঠনের ব্যাপারে আমার কোনও যোগ ছিল না। তারা বেগম জিনাত মহলের হাবেলী লুট করতে গিয়েছিল। এরকম অবস্থা কী করে প্রমাণ হয় যে ওই লুটতরাজ হয়েছিল আমার নির্দেশানুসারে?

আমার বিরুদ্ধে বলা হয়েছে যে, সাহায্যের জন্য আমি একটা চিঠিসহ হাবশি কাম্বা নামে জনৈক কর্মচারীকে পারস্যের সুলতানের কাছে পাঠিয়েছিলাম। পারস্যের সাহায্য নিয়ে ইংরেজ সরকারকে উৎপাটিত করার আমি নাকি চেষ্টা করেছিলাম। এই কথার মধ্যে এতটুকু সত্য নেই। একথা ঠিকই কাম্বা হিন্দুস্থান

পরিত্যাগ করেছিল, যাওয়ার আগে সে আমার অনুমতি নিয়েছিল তাও ঠিক, কিন্তু সে তো পারস্যে যায়নি, তাছাড়া কারোর কাছ থেকে সে তো কোনও চিঠি নিয়ে যায়নি। হজ্ব করার জন্য সে পবিত্র মক্কা শরিফে যাত্রা করে।

মহম্মদ দরবিশের কাছ থেকে আমার চিঠি উদ্ধার করে এ আদালতে পেশ করা হয়েছে। সে ব্যাপারে আমাকে ওই একই প্রত্যুত্তর দিতে হবে। চিঠিটা পরীক্ষা করলেই আমার বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে। আমার কোনও প্রতিপক্ষ যদি আমার নামে এরকম একটা জাল চিঠি লিখে আমার অসুবিধায় ফেলার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তার দায়ও কি আমায় নিতে হবে? তার জন্য কি আমাকেই দায়ী হতে হবে?

বিদ্রোহী সৈনিকেরা বাদশাহ হিসাবে আমায় আদৌ কোনও সম্মান করত না। তারা আমার সামনে যখন আসত, কদাচিৎ তারা আমায় অভিবাদন জানাত। এমনকী দিওয়ান-ই-খাস ও জুমা মসজিদে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে পায়ের জুতো পর্যন্ত খুলত না। এতে কী বোঝা যায়, তারা কি আমায় সত্যিকারের বাদশাহের মর্যাদা, সম্মান দিয়েছিল? অথবা এতে কি এটাই প্রমাণ হয় এই বিদ্রোহের নায়ক আমি? আসলে তারা আমাকে তাদের স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য ব্যবহার করতে চেয়েছিল এবং কোনও ক্ষেত্রে তাতে সফলও হয়েছিল। আমি তাদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিলাম। আমি ছিলাম অসহায়, সম্বলহীন কোনও অস্ত্র-শস্ত্র, কামান-বন্দুক বা গোলাবারুদ আমার অধিকারে ছিল না। বিপরীত দিক থেকে বলতে গেলে সে সবই ছিল ইংরেজদের অধীনে। তাহলে তারা কেন বিদ্রোহীদের দমন করতে সফল হয়নি? তাদের ব্যর্থতার দায় আমার উপর কেন চাপানো হচ্ছে?

ইংরেজ সেনাপতিরা বিদ্রোহী সিপাহীদের দমন করতে পারেনি বলেই কি তাদের বিরুদ্ধে তো কোনও অভিযোগ আনা হয়নি! হয়নি তো কোনও বিচার সভার আয়োজন। তবে আমার মতো বৃদ্ধ ক্ষমতাহীন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ আনা হচ্ছে কেন?

আমার দেহরক্ষীদের সম্বন্ধেও কথা উঠছে। তাদের আমি রেখেছিলাম ঠিক, তারা কেউ কোনও সৈন্য বাহিনীর নিয়মিত সৈনিক ছিল না, তারা সবাই ছিল আমার পুরাতন পরিচারক মাত্র। তাদের আমার কাছে রাখতাম আমার নিজের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে, রাখতাম ভয়ে। আমি যে কতো বিরাট মাপের স্বাধীন বাদশাহ ছিলাম এটাও একটা প্রমাণ।

সত্যি কথা বলতে কী, আমি কখনও বিদ্রোহী সৈনিকদের উপর আস্থা বা ভরসা পাইনি। তাই আত্মরক্ষার জন্য প্রাসাদ ত্যাগ করে আশ্রয় নিয়েছিলাম প্রয়াত বাদশাহ্ হুমায়ুনের সমাধি সৌধে।

সেখানে অবস্থানকালে ইংরেজ শক্তি যখন আমাকে আত্মসমর্পণ করতে অনুরোধ করে, তখন আমি তাই করি। আমাকে কথা দেওয়া হয়েছিল আমার কোনও ক্ষতি করা হবে না বা সম্মানহানি হবে না।

উপরোক্ত সমস্ত বিবরণ সত্য। একটা কথাও মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নয়। আল্লাহের নামে অঙ্গীকার করে বলতে পারি— আমি যা বলেছি সব সত্যি, নির্ভেজাল সত্যি। বিদ্রোহী সিপাহিদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণসহ একটি চিঠি এবং মক্কায় যাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে আর একটি চিঠি এই আদালতে পেশ করা হয়েছে। দাবি করা হয়েছে ওগুলো আমার লেখা। আমি নিশ্চিত বলতে পারি ওই চিঠি একটাও আমার লেখা নয়। বিশ্বাসযোগ্যও নয় চিঠি লেখা হয়েছে উর্দুতে। আমি নিজে উর্দু লিখি না। সেরেস্তাখানাতেও কোনও চিঠি উর্দুতে লেখা হয় না। লেখা হয় ফারসি ভাষায়। সুতরাং একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে চিঠিগুলো জাল এবং তৈরি করা।

একথা ঠিক যে আমি মক্কাতে যাব বলে ভেবেছিলাম বিদ্রোহী সিপাহিদের কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হয়েই তা করেছিলাম।

সে সময় আমি কতটা অসহায় হয়েছিলাম, আমার সিপাইদের প্রতি আমার সমর্থন কতখানি আন্তরিক ছিল, এ ঘটনা তার প্রমাণ দেয়। কথা বাড়িয়ে সময় নষ্ট করতে চাই না। যা বলেছি আমি যে নির্দোষ তা প্রমাণ করার পক্ষে আমার মনে হয় যথেষ্ট।

মহামান্য বিচারকগণ এতক্ষণে আমার তৎকালীন অবস্থা এবং বর্তমান বক্তব্য সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছেন বলেই আমার বিশ্বাস।

ধ্বংসপ্রাপ্ত দিল্লি পরিদর্শনে এসেছিলেন উইলিয়াম হাওয়ার্ড রাসেল, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সংবাদ পাঠানো পথিকৃৎ ছিলেন তিনি। তিনি লিখেছিলেন :

যদি ইংরেজ সামরিক আদালতের পরিবর্তে ফৌজদারি আদালতে বাহাদুর শাহ জাফরের বিচার হত, ইংরেজ উকিল দেখতেন, জাফরকে অভিযুক্ত করার পক্ষে বেশ কঠিন। তিনি যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন সে বিষয়ে কোনও প্রমাণই ছিল না।

একের পর এক সাক্ষীরা তাদের বক্তব্য পেশ কতে লাগল এবং বাহাদুরশাহ্ জাফর যে নির্দোষ তা পরিষ্কার হতে আরম্ভ করল, এবং তিনি দিল্লিবাসীদের

রক্ষার জন্য রাস্তায় নেমে ছিলেন অনেকের বয়ানে তাও ছিল। বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকজন দিল্লি শহর লুট করেছিল, জাফর ওইসব কার্যকলাপকে রোধ করবার চেষ্টা করেছিলেন [ডেল: ৪৪২]।

প্রায় দুই মাস টেনে নেওয়া হল বিচার বিচার খেলা। শেষে ৯ মার্চ শেষ হল 'বিচার'। ভিড় থিক থিক করছিল বিচারকক্ষে, ওই দিন সকাল ১১টার সময় আড়াই ঘন্টা ধরে হারিয়ট দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করলেন। বেলা ৩টের সময় বা কিছু আগে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা হবে বলে সিদ্ধান্ত করা হয়। আগেই বলা হয়েছে বাহাদুর শাহ জাফরকে দোষী সাব্যস্ত করার মতো কোনও প্রমাণ ছিল না, আবার এটাও সত্যি জাফরকে যে চরম শাস্তি দিতে হবে সেই সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছিল বিচার শুরুর আগেই। সওয়াল-জবাব, সাক্ষী, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া ইত্যাদি সবই ছিল নাটকের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হারিয়ট তাঁর 'মূল্যবান' বক্তৃতায় জানালেন সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে :

বাহাদুর শাহ্ জাফরের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনা হয়েছিল প্রতিটিতেই তিনি দোষী প্রমাণিত। দুর্বৃত্ত ও ষড়যন্ত্রকারীদের এসব ক্ষেত্রে একটাই শাস্তি, তা হল মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু হাডসন কে ধন্যবাদ, তিনি 'কথা দিয়েছিলেন' বাহাদুরশাহ্ জাফরকে হত্যা করা হবে না, সুতরাং এক্ষেত্রে তাঁকে হত্যার আদেশ দেওয়া কার্যত অসম্ভব। তাঁকে নির্বাসনে পাঠানো হবে, হিন্দুস্থান থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হবে। হয় আন্দামান অথবা গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল যেখানে মনে করবেন সেরকম কোনও জায়গায় [ডেল : শেষ মোগল, পৃষ্ঠা ৪৪২-৪৪৩]।

বাহাদুর শাহ জাফরকে নির্বাসিত করা হবে সে সিদ্ধান্ত আগেই ছিল, সামরিক আদালতের রায়ে তাতে সিলমোহর পড়ল। সমস্যা তৈরি হল স্থান নির্বাচন নিয়ে। দিল্লি ও কলকাতার মধ্যে সাত মাস ধরে লাগাতার চিঠি আদান প্রদানের পর কিছুতেই স্থির সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছিল না, আন্দামান, নাকি আফ্রিকা কোথায় পাঠানো হবে। যদি কাছাকাছি কোনও জায়গায় রাখা হয় আবার হয়তো ভবিষ্যতে তাঁকে উদ্ধার করার চেষ্টা হবে, এই ছিল ইংরেজদের ভয়। ১৮৫৮ সালে সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে জাফরকে নির্বাসনের পথে পাঠানো স্থির হল, নিরাপত্তা রক্ষীর প্রধান আধিকারিক হিসাবে নিয়োগপত্র পেলেন লেফেন্যান্ট ওমানি। তাঁর উপর কড়া নির্দেশ ছিল যাত্রাপথে বন্দি জাফর যেন কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারেন।

১.৭. নির্বাসনের পথে যাত্রা ।

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ অক্টোবর [অথবা ৮] জহিরউদ্দিন মুহম্মদ বাবর পাদিশাহ

গাজি পানিপথের ময়দানে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপনের সূচনা করেছিলেন। তার ঠিক ৩৩২ বছর বাদে ১৮৫৮ সালের ৭ অক্টোবর ভোর ৪টেয় গরুর গাড়িতে চাপিয়ে শেষ মোগল বাদশাহকে হিন্দুস্থান থেকে বিতাড়িত করার যাত্রা আরম্ভ হল। এক আশ্চর্য সমাপতন, ঠিক এক দিনে, ৩৩২ বছর পর। তাঁর সঙ্গে চললেন কয়েকজন পত্নী, জীবিত দুই পুত্র ও এক কন্যা। জওয়ান বখ্‌ত বাদেও জাফরের উপপত্নী, মুবারক উন্নিসার গর্ভজাত জাফরের কনিষ্ঠতম পুত্র মির্জা শাহ আব্বাস বন্দি বাদশাহের সাথে দিল্লি ছাড়েন, সেই সময় মির্জা শাহ আব্বাসের বয়স ছিল তেরো বছর মাত্র [জন্ম ১৮৪৫]। ওই যাত্রায় মুবারক উন্নিসা বেগমও ছিলেন। জওয়ান বখ্‌তের পত্নীও ছিলেন ওই যাত্রায়। প্রত্যেকে চললেন যমুনার উপর নৌকা দ্বারা তৈরি সেতুর উপর দিয়ে, তাদের যাওয়া দেখে কেউ এতটুকু হাহুতাস করল না, চিৎকার করল না, করবেই বা কী করে তখন তো ঠিকমতো দিনের আলোই বার হয়নি। অক্টোবরের প্রথমে দিল্লিতে ৪টের সময় যে রীতিমতো অন্ধকার। [ডেলরেম্পল : ৪৪৪]।

গাড়ির পর গাড়ি পর পর চলল নির্বাসনের পথের যাত্রীদের নিয়ে বল্লমধারী সশস্ত্র অশ্বারোহীর দল ঘিরে থাকত বাহাদুরশাহ জাফর এবং তাঁর পুত্রের গাড়ির পাশে। জিনাত মহল বেগমের গাড়ি ঘেরা ছিল পর্দা দিয়ে, তাঁর সঙ্গে ছিল জওয়ান বখ্‌তের যুবতী পত্নী নবাব শাহ জমানি বেগম এবং তার মা মুবারক উন্নিসা (শাহ্ আব্বাসের মা নয়)। তৃতীয় গাড়িতে খোজা খাজা বালিশ। চলছিল জাফরের হারেমের পরিচারিকাগণ, প্রতিটি গাড়ির চতুর্দিকে বল্লমধারী নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা ছিল। [ডেলরেম্পল : ৪৪৬-৪৭]।

এইভাবে পথ চলতে চলতে সমগ্র বাহিনী কানপুরে এসে পৌছলো। সেখানে বাষ্পীয় ইঞ্জিনে টানা রেলগাড়ি দেখে বিস্ময়ে নির্বাক হল গোটা বন্দিশিবির। অদ্ভুত আওয়াজ করতে করতে ছুটেচলা গাড়ি, মাঝে মাঝে তীব্র শব্দে বেজে ওঠা বাঁশি, সব মিলিয়ে তাদের কাছে ছিল ভয় ও শিহরণ তৈরি করা জিনিস। প্ল্যাটফর্মের উপর ইংরেজরা রাজকীয় বাজনা বাজাচ্ছিল। ট্রেনে চেপেই তাঁরা পৌছল ইলাহাবাদ, চারিদিকেই সংঘর্ষের চিহ্ন ছড়িয়েছিল। তাঁরা পার হলেন সুনিয়া (Suniah) দুর্গ এলাকা। এটি বিদ্রোহীরা দীর্ঘ দিন দখলে রেখেছিল, জাফর দেখতে দেখতে চলছিলেন। তিনি ওমানিকে বলতে লাগলেন সমুদ্র দেখা ও জাহাজে চড়বার জন্য তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

ওমানি প্রতিদিন বন্দিদের অবস্থা বিষয়ে প্রতিবেদন পাঠাতেন। এক প্রতিবেদনে জর্জ ওয়াগেন ট্রিবারকে লিখেছেন :

'সবকিছু মিলিয়ে বন্দিরা বেশ আনন্দে আছেন। পর্দার আড়ালে মহিলাগণ কথা বলেন এবং হাসেন। দিল্লি থেকে চলে আসায় মনে হয় না তারা খুব একটা কষ্ট পেয়েছেন [ডেলরেম্পল : ৪৪৭ পৃষ্ঠা]।

দিল্লি থেকে যাত্রা করার আগে বন্দিদের মানসিক অবস্থা কিন্তু ওরকম ছিল না। ইংরেজরা তাঁদের উপর যতভাবে অপমান করা যায় তা করেছিল। সে বাদেও তারা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতার জেরবার হয়ে যাচ্ছিল। ওমানির বক্তব্য অনুযায়ী :

দিল্লি ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে বেগম জিনাত মহল পুত্র জওয়ান বখতের সঙ্গে উচ্চস্বরে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন। জওয়ান বখ্‌ত হারেমে পিতার একজন উপপত্নীর সঙ্গে প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন, গোলমালের কারণ ছিল ওটাই। পারিবারিক ওই রকম চূড়ান্ত আর্থিক ও রাজনৈতিক প্রতিকূলতার মধ্যেও মির্জা জওয়ান বখ্‌ত রক্ষীদের উৎকোচ দিয়ে কম মূল্যের নিকৃষ্ঠ ধরনের গাঢ় বাদামি রঙের এক ধরনের বীয়ার আনাতেন। মূল্যবোধ ও আর্থিক অবস্থা কোথায় নেমেছে শাহি পরিবারের। মা ও পুত্র পরস্পরের শত্রু! পিতার উপপত্নীর সঙ্গে পুত্রের অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা! ধর্মীয় অনুশাসন ভেঙে সুরাপান! [ডেলরেম্পল : ৪৪৮ পৃষ্ঠা]।

বেগম জিনাত মহলের চিরন্তন প্রতিপক্ষ বেগম তাজমহলের সঙ্গেও কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন মির্জা জওয়ান বখ্‌তের মা। সিপাহি বিদ্রোহের তিন বছর আগে থেকেই বেগম তাজ মহলকে বন্দি করা হয়েছিল। জিনাত মহলের সঙ্গে বাহাদুর শাহের বিবাহের আগে বেগম তাজ মহলই ছিলেন সর্বেসর্বা, অত্যন্ত প্রতিভাশালী নারী। কিন্তু দ্রুতগতিতে তাঁর আসন থেকে যেন ঠেলে ফেলেন জিনাত মহল। আর হবেই বা না কেন, যখন তাঁর বিয়ে হয় বয়স ছিল মাত্র ১৯ বছর, অন্যদিকে বাদশাহের বয়স ৬৪ বছর, স্বাভাবিকভাবেই মধ্যবয়স্কা তাজ মহল বেগমের চেয়ে বাদশাহের মহব্বত যে যুবতী (নাকি কিশোরী?) বেগম জিনাত মহলের প্রতি ঝুঁকবে সে তো আর বলবার অপেক্ষা রাখে না।

বেগম তাজমহলের বন্দি হওয়ার আগে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি নাকি বাহাদুর শাহ জাফরের এক ভ্রাতুষ্পুত্র (অথবা ভাগিনেয়) মির্জা কামরানের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন। দিল্লিতে সিপাহি বিদ্রোহের কারণে যদি এক জনেরও লাভ হয়ে থাকে তিনি এই বেগম তাজ মহল। তিনি স্পষ্ট জানালেন যে বাদশাহের সঙ্গে তাঁর কোনও লেনাদেনা নেই। জিনাত মহল বা বাদশাহ্

কারও সাথে তিনি এক কদম বাইরে যেতে রাজি নন। তিনি ওমানিকে জানালেন 'বাদশাহ্‌কে সেবা করবার কোনও কিছুই আমার নেই। তাঁর ঔরসজাত কোনও পুত্রও আমার নেই, এক সামান্যতম পথ তাঁর সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা আমার নেই।

'খুব ভালো কথা সম্মাননীয়া তাজ মহল জি, আপনি অবশ্যই প্রাক্তন বাদশাহের বাসস্থানে যাবেন, যেতে বাধ্য আপনি। যদি আপনি নিজের ইচ্ছায় যেতে না চান জোর করেই আমাকে তা হলে নিয়ে যেতে হবে আপনাকে', ওমানি জবাব দিলেন।

আরও দৃঢ়তার সাথে বেগম তাজমহল প্রত্যুত্তর দিলেন, 'প্রয়োজনে আপনি আমাকে হত্যা করতে পারেন, কিন্তু আমি যাব না [স্যান্ডার্স কে লেখা ওমানির চিঠি, তারিখ অক্টোবর, ১৮৫৮, পত্রাঙ্ক ২৭২]।'

স্যান্ডার্সকে লেখা চিঠিতে ওমানি জানিয়েছিলেন যে 'বন্দি বাদশাহের শিবিরের কেউই বেগম তাজমহলকে পছন্দ করতেন না। সব মিলিয়ে তিনি গেলে একটা বোঝা হয়ে থাকবেন।'

সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল ইলাহাবাদে এসেই গোটা মোগল শিবির বিমর্ষ হল। যে ইলাহাবাদ দুর্গ ছিল তাদের পূর্ব-পুরুষের আজ তা ইংরেজদের দখলে। মূল শিবির থেক কিছুটা দূরে দূরে চলছিল বেগম তাজমহলসহ জাফরের উপপত্নীরা, মির্জা জওয়ান বখ্‌তের শাশুড়ি, বেগম জিনাত মহলের মা, মির্জা জওয়ান বখ্‌তের শ্যালিকা, বেগম জিনাত মহলের ভগিনী প্রমুখ। মোগল পরিবারের ৩১ জনের মধ্যে ষোলো জন সিদ্ধান্ত নিলেন তারা নির্বাসনে যেতে রাজি নন। সেই ষোলো জনের মধ্যে ছিলেন পূর্বোক্ত বেগম তাজমহল, বেগম জিনাত মহলের মা ও ভগিনী এবং বাহাদুর শাহের কয়েকজন উপপত্নী।

ঠিক সেই সময় লর্ড ক্যানিং ইলাহাবাদেই ছিলেন, তিনি আলোচনা করলেন ওমানির সাথে। তার আগেও কিন্তু ঠিক ছিল না বন্দি সম্রাটকে নির্বাসনে পাঠানো হবে কোথায়, বর্মা নাকি অফ্রিকার কেপটাউন, না আন্দামান। ইলাহাবাদে ক্যানিং জানালেন প্রাক্তন ভারত সম্রাটকে বর্মার রেঙ্গুনে নির্বাসন পাঠানো হবে। কিন্তু রেঙ্গুনে বাহাদুর শাহ্‌ জাফরকে ঠিক কোথায় রাখা হবে তখনও তা স্থির ছিল না। নাকি তাঁকে কারেন (Karen) পার্বত্য এলাকার টোঁউঙ্গু (Tounghoo) তে রাখা হবে সে নিয়েও প্রশাসন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। রেঙ্গুনের চেয়ে টোউঙ্গুতে বিচ্ছিন্নবস্থায় রাখা সহজ ছিল, কারণ হিন্দুস্থান থেকে ওই এলাকা ছিল অধিকতর দুর্গম ও দুরবর্তী।

ইতিমধ্যে বাহাদুরশাহ জাফরের শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করা হয়েছিল। চিকিৎসকগণ জানিয়ে দিলেন বয়সজনিত কারণে যে যে সমস্যা থাকা স্বাভাবিক

সেগুলি বাদে তাঁর অবস্থা ভালোই। দীর্ঘসমুদ্র যাত্রার ধকল তিনি নিতে পারবেন কি না তা নিয়ে অনেকে চিন্তায় ছিলেন। [ডেলরেম্পল : ৪৪৯]।

রেঙ্গুনে পাঠানোর সিদ্ধান্তই শেষ পর্যন্ত বহাল রইল। রেঙ্গুনস্থ ইংরেজ প্রতিনিধি ফায়রে কে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হল :

বন্দিদের যেন কড়া নিরাপত্তার বলয়ে নিরাপদে রাখা হয়, মৌখিক বা লিখিত কোনওভাবে তাদের সঙ্গে কেউ যেন যোগাযোগ করতে না পারে অথবা তারাও যেন সে সুযোগ না পায়। নির্দিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ যেন বন্দিদের কাছে না যায়... বন্দিদের প্রতি যেন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তাদের সঙ্গে যেন সৌজন্যমূলক আচরণ করা হয়... তাদের যেন অমর্যাদা করা না হয়, নিরাপদে রাখবার জন্য যেটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি বিলাসিতা যেন দেওয়া না হয়। সবকিছু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু যেন সরবরাহ করা হয়, কিন্তু কোনও অবস্থাতে যেন তাদের নগদ অর্থ ভাতা হিসাবে দেওয়া না হয়।

লেফ্টেন্যান্ট ওমানি আপাতত বন্দিদের দেখাশোনার দায়িত্বে থাকবেন। প্রতিদিন তিনি বন্দিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, কী কী জিনিসের প্রয়োজন রোজ খোঁজ খবর নেবেন এবং সেই অনুযায়ী তিনি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। কোনও বিলম্ব না করে, কোনও পরিস্থিতির দোহাই না দিয়ে প্রয়োজনীয় ওই সব সামগ্রী যেন সরবরাহ করাহয় [ডেল : ৫০ পৃষ্ঠা]।

ষোলো জন বিদায় নেওয়ার বাদশাহের সঙ্গীর সংখ্যা কমে গেল। ১৫ জনের দল ইলাহাবাদ থেকে যাত্রারম্ভ করল। ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ নভেম্বর। ইলাহাবাদ থেকে বন্দি বাদশাহ কে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল জলপথে। দুদিন পরে পৌঁছলেন মির্জাপুরে এবং তাঁদের তোলা হল 'টেমস্' নামক স্টিমারে।

ওমানি প্রতিবেদনে জানিয়েছেন :

রাজবন্দিদের চোখে মুখে কোনও উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা নেই। বিশেষ করে বৃদ্ধ বন্দিকে বেশ আনন্দিত দেখাচ্ছে। এই প্রথম তিনি কোনও বড়ো জাহাজে উঠলেন। [স্যানডার্সকে লেখা ওমানির চিঠি : ক্রমাঙ্ক ২৪৮, তারিখ ২৩.১১.১৮৫৮]।' [ডেলরেম্পল :৪৫০]।

গঙ্গায় ধীরে ধীরে স্টিমার যাচ্ছিল। বেনারসের সুন্দর সুন্দর মন্দির ও গঙ্গার ঘাটগুলি পার হচ্ছিল এক এক করে। নদীতে টহল দিচ্ছিল ইংরেজদের নজরদার নৌকা, বিদ্রোহীদের খোঁজে তারা ঘুরছিল। রামপুরে এসে তাঁরা জলযান বদল করল, 'টেমস' ছেড়ে উঠতে হল 'কোইলে' স্টিমারে, স্টিমার ডায়মণ্ড হারবারে

এসে পৌঁছল ৪ ডিসেম্বর। এখানে বাহাদুর শাহ জাফর এবং তাঁর সঙ্গীদের তোলা হল 'এইচ এম এস মাগারা' নামক জাহাজে। মাতৃভূমিকে চিরদিনের মতো পরিত্যাগ করে এগিয়ে চললেন শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর।

৪ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় হিন্দুস্থানের প্রাক্তন বাদশাহকে নিয়ে সম্মাননীয়া ইংল্যান্ডের রাণির উন্নত মানের যুদ্ধজাহাজ 'মাগারা' যাত্রা করে। ওমানি বন্দিদের নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে ছিলন।

একপত্নী, পুত্রবধু শাহ্‌জমানি বেগম (মির্জা জওয়ান বখ্‌তের পত্নী), পুত্র ও এক পৌত্রকে নিয়ে বন্দি যাচ্ছেন, তাঁর গায়ে জড়ানো ছিল একটা কাশ্মীরি শাল। তাঁকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। খুব দ্রুততার সঙ্গে তাদের 'মাগারা' যুদ্ধ জাহাজে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এবং গোটা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে সেনাবাহিণী কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করল এবং হুগলি নদীপথে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে থাকে রাজকীয় যুদ্ধজাহাজ 'মাগারা'।...

পাঁচদিন একটানা চলার পর ৮ ডিসেম্বর 'মাগারা' প্রবেশ করল রেঙ্গুন নদীতে। কিছুটা যাওয়ার পর জাহাজের যাত্রীরা সোনালি রঙের অসাধারণ প্যাগোডা দেখল। ওমানি লিখেছেন, '২০ মাইল দূর থেকে অসাধারণ সুন্দর প্যাগোডাটি আমার চোখে পড়ল রেঙ্গুন নদীতে জাহাজ প্রবেশ করতেই ইটের তৈরি তিনতলা স্থাপত্য, ভিত থেকে শীর্ষদেশ পর্যন্ত একটা বিশৃঙ্খল স্থাপত্যের নমুনা, কিছুটা উঠেই যেন আকাশে ডানা মেলেছে, গোটাটাই সোনার পাতে মোড়া।' [ডেলরেম্পল ৫৫১-৫২]

ক্যানিং তাঁর চিঠিতে ইংরেজ প্রতিনিধি ফায়রে কে যা যা নির্দেশ দিয়েছিলেন, বলাবাহুল্য তার কিছুই রূপায়ণ হয়নি, ওমানি বিরক্ত বোধ করেছিলেন মেজর ফায়রের কার্যকলাপে। এমনকী বন্দি বাদশাহ্‌ কোন্‌ বাড়িতে থাকবেন তার বন্দোবস্তও ছিল না। মেজর ফায়রে নাকি জানতেন না যে বন্দির্দের স্থায়ীভাবে কোথায় রাখতে হবে। ওমানি স্যান্ডার্সকে লিখলেন :

আপাতত দুটো ছোটো ঘর ব্যবস্থা করা হয়েছে, দিল্লির প্রাসাদের তুলনায় যা নিতান্তই নগণ্যতম। পরিচারিকাদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে চারটি অস্থায়ী তাঁবু। মহিলাদের থাকবার জায়গার চতুর্দিকে মোটা ক্যানভাসের 'কানাত' দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। নুন্যতম স্বাচ্ছন্দ্য এখনও বন্দিদের জন্য ব্যবস্থা করা যায় নি। এখন যে অবস্থায় তাঁরা রয়েছেন তার চেয়ে অধিকতর ভালো ব্যবস্থা করতে সরকার দায়বদ্ধ।

১.৮. শাহ্‌জাদা মির্জা জওয়ান বখ্‌ত ।

তাজমহল বেগমের পুত্র ছিলেন মির্জা ফতে উল মুল্‌ক বাহাদুর, সাধারণভাবে তিনি পরিচিত ছিলেন মির্জা ফকরু নামে। যেহেতু বাদশাহের প্রিয়তমা পত্নী ছিলেন তাঁর মা তাজমহল বেগম, স্বাভাবিকভাবে মায়ের প্রভাবে ভাবা হচ্ছিল তিনি হবেন পরবর্তী মোগল বাদশাহ্‌।

পরিস্থিতির দ্রুত বদল ঘটল জিনাত মহলের সঙ্গে বাহাদুর শাহ জাফরের বিবাহের পর থেকেই। সরে গেল বেগম তাজমহলের প্রধান সম্রাজ্ঞীর প্রভাব, টলে গেল আসন। বিবাহের একবছর পর অর্থাৎ ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে বেগম জিনাত মহল জন্ম দিলেন এক পুত্র সন্তানের, তখন তাঁর বয়স কুড়ি বছর এবং সন্তানের পিতার বয়স ৬৫ বছর। সেই পুত্রই মির্জা জওয়ান বখ্‌ত, বেগম জিনাত মহলের একমাত্র সন্তান। পুত্র সন্তান জন্মের পরই জিনাত মহল বেগমের ধ্যানজ্ঞান ছিল কী ভাবে পুত্র মির্জা জওয়ান বখ্‌তকে মসনদে বসানো যায়।

প্রধান সম্রাজ্ঞীর পদ থেকে বেগম তাজমহলকে হঠানো সম্ভব হলেও তার পুত্র মির্জা ফতে-উল-মুল্‌ক বাহাদুর ওরফে মির্জা ফকরুর পরবর্তী বাদশাহ হওয়ার দাবিকে তিনি কোনও যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করতে পারছিলেন না, অথচ বেগম জিনাত মহলের স্বপ্ন ছিল মির্জা জওয়ান বখ্‌ত কে মসনদে বসানোর, তিনি হবেন সম্রাজ্ঞীর মা তথা 'মরিয়ম জমানি'।

২ এপ্রিল, ১৮৫২, শাহ্‌জাদা মির্জা জওয়ান বখ্‌তের বিবাহ হল মালাগড়ের ওয়ালিদাদ খানের কন্যা নবাব শাহ জমানি বেগমের সঙ্গে। বিবাহের সময় পাত্রের বয়স ছিল ১১ বছর, আর পাত্রীর ১০ বছর। এই বিবাহের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল বেগম জিনাত মহলের কাছে। পুত্রকে সাবালক প্রমাণ করার জন্য দ্রুত তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়। রাজকীয় শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফর, তিনি বসেছিলেন স্বর্ণখচিত হাওদাতে। দিল্লির যে পথে শোভাযাত্রা যাওয়ার কথা ছিল, তা সাজানো হয়েছিল, বাদ্যযন্ত্রী, আতসবাজি, রঙিন আলো, আগত অতিথি আপ্যায়নের এলাহি ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু সবই করা হয়েছিল দিল্লির বিশিষ্ট মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে।

মির্জা জওয়ান বখ্‌ত ছিলেন বাহাদুর শাহ জাফরের পঞ্চদশ পুত্র। পাত্রীর পিতা ওয়ালিদাদ খানের সঙ্গে বেগম জিনাত মহলের রাজনৈতিক বোঝাপড়া ছিল। জওয়ান বখতের বিবাহে যে রাজকীয় ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়েছিল দিল্লিবাসী বিগত একশত বছরে অধিক সময়েও ওরকম দেখেনি। বাদশাহি রান্নাঘর

থেকে বাদশাহি খানা প্রতিটি আধিকারিকদের প্রাসাদে কয়েকদিন ধরে পাঠানো হচ্ছিল, সবকিছু হচ্ছিল চোখ ধাঁধানো। ওই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী জাহির দেহ্‌লাভি ৬০ বছর বাদে স্মৃতি রোমন্থন করে লিখেছেন :

এরকম সৌন্দর্য ও রাজকীয় ব্যবস্থাপনা আগে দেখা যায়নি, অন্তত, আমি তো আমার জীবদ্দশায় দেখিনি। যে জৌলুসের সঙ্গে অনুষ্ঠান হয়েছিল কোনও দিন তা ভুলবো না। [ডেল : ৩০]।

বিবাহের তিনদিন আগে থাকতে আরম্ভ হয়েছিল অনুষ্ঠান। জওয়ান বখ্‌তের অন্যান্য বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের বিবাহ হয়েছিল অত্যন্ত সাদামাটা, সাধারণ ব্যবস্থাপনার মধ্যে। কারণ রাজকীয় বন্দোবস্ত করবার মতো অবস্থা ছিল না বাদশাহি কোষাগারে, মির্জা জওয়ান বখ্‌তের সময়ে অবস্থার কি উন্নতি ঘটেছিল? আদৌ তা নয়, কিন্তু পূর্ববর্তী যে সমস্ত শাহ্‌জাদাদের বিবাহ হয়েছিল তাদের অনুষ্ঠানকে টেক্কা দেওয়াই ছিল বেগম জিনাত মহলের মূল লক্ষ্য। চোখ ধাঁধানো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হল প্রকৃত 'শাহ্‌জাদার' বিবাহ হচ্ছে।

বিবাহের তিন দিন আগে ওয়ালিদাদ খানের বাড়ি থেকে বিবাহের মূল্যবান উপহার সামগ্রীসহ শোভাযাত্রা পৌঁছেছিল দিল্লির কেল্লা-প্রাসাদে। শোভাযাত্রার পিছনে ছিল রঙিন আতস বাজি, রং মশালের ঝলকানি, ছিল একদল প্রশিক্ষিত হস্তিবাহিণী, উটের সারি, সুসজ্জিত একদল ঘোড়া। এই শোভাযাত্রা ছিল 'মেহেন্দি' পরানোর উৎসবের জন্য। পাত্র পাত্রীর হাতে 'হেনা' দ্বারা মেহেন্দি পরানোর পর তাঁদের আত্মীয় স্বজনদের পালা এবং বিবাহের সাতদিন পরও চলেছিল অনুষ্ঠান, এটাই ছিল রীতি। [ডেল: ৩১]।

প্রাসাদের প্রাচীরে ও অন্যান্য ছোটোখাটো জীর্ণবস্থা সংস্কার হল, আলোকমালায় সাজানো হল গোটা প্রাসাদ, মশাল, মোমবাতির আলোয় চাঁদনি চক, বেগম সুমরু'র হাবেলী (বর্তমান 'নতুন দিল্লি ব্যাঙ্ক') সহ সন্নিহিত এলাকায় হাজার হাজার মোমবাতি ও মশাল জ্বেলে টানা দুই তিন মাস ধরে সাজানো হয়েছিল, 'শাহজাদা'র বিবাহ বলে কথা!!

বিবাহের দিন সন্ধ্যায় বাদশাহি শোভাযাত্রা বেরিয়ে ছিল। 'রাতজাগা' অনুষ্ঠানের সূচনায় বাহাদুর শাহ পুত্রকে মুক্তো দ্বারা তৈরি অবগুণ্ঠন 'সেহ্‌রা' উপহার দিয়েছিলেন। প্রাসাদে আহ্বান করা হয়েছিল নর্তকী এবং সংগীত শিল্পীদের। শহরের বাছাই করা লোকজন, প্রাসাদের শিশুরা, শিক্ষার্থীগণ, প্রবীণ আধিকারিকগণ এবং শাহাজাদাদের পৃথক পৃথক জায়গায় বসে সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান দেখবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

সান্ধ্য শোভাযাত্রা গিয়েছিল সাদা পাথরে তৈরি জামা মসজিদের পাশ দিয়ে, খাস বাজার, সুনেহেরি মসজিদ, ফাইজ বাজার হয়ে দরিয়াগঞ্জ। দরিয়াগঞ্জ পেরিয়ে নবাব ঝাঝরের 'কোঠি', তারপর শেষে ওয়ালিদাদ খানের হাবেলী। যাত্রা পথে মহামান্য বাদশাহের আধিকারিকগণ উপহার তথা 'নজর' পেশ করেছিলেন, বৃদ্ধ সম্রাট হস্তিপৃষ্ঠে বসে দেখছিলেন রাজপথের দুই পাশের সুসজ্জিত আলোক মালা।

সমগ্র শোভাযাত্রায় ছিলেন কেল্লা প্রাসাদের নিরাপত্তা রক্ষীদের আধিকারিক ক্যাপ্টেন ডগলাস, তিনি ওয়ালিদাদ খানের প্রাসাদ পর্যন্ত গিয়েছিলেন এবং পরেরদিন সকাল ১০টার সময় শোভাযাত্রা কেল্লা প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করেছিল। পাল্লা দিয়ে ওয়ালিদাদ খানের আয়োজনও কম ছিল না। বিবাহের ওই রাত্রে তিনিও আনিয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ নতর্কীদের, আহ্বান করা হয়েছিল সেরা গায়কদের। বিবাহ উপলক্ষে কবিতা পাঠ করেন দরবারের কবি জওক, এবং তাঁর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী কবি মির্জা নাওশা ওরফে মির্জা গালিব।

সব মিলিয়ে একাদশ বর্ষীয় শাহ্জাদা মির্জা জওয়ান বখ্তের বিবাহ সম্পন্ন হল দশম বর্ষীয়া নবাব শাহ জমানি বেগমের সঙ্গে। [ডেল: ৩২, ৩৫]।

১.৯. মির্জা ফতে-উল-মুল্ক বাহাদুর ফকরু।

তাজমহল বেগমের পুত্র মির্জা ফকরু। ইংরেজরা এক এক করে মোগল বাদশাহের সমস্ত ক্ষমতা, কর্তৃত্ব কেড়ে নিচ্ছিল। ১৮৪৭-৪৮ সাল নাগাদ সবচেয়ে বেদনাদায়ক নির্দেশটি এল বাদশাহের কাছে, তাতে বলা ছিল তিনি ইচ্ছা মতো তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী বাছাই করতে পারবেন না। এর ফলে বাদশাহের সম্মানহানি পৌঁছল চূড়ান্ত পর্যায়ে, সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়লেন প্রিয়তমা সম্রাজ্ঞী বেগম জিনাত মহল। তিনি চাইছিলেন তাঁর পুত্র মির্জা জওয়ান বখ্ত কে মসনদে বসাতে, নামেই মসনদ, নেই সাম্রাজ্য, নেই কর্তৃত্ব, অর্থ, সৈন্য, লোকবল তবুও তো মসনদ, তক্ত্-ই-তৌস, সাম্রাজ্য বলতে শুধু মাত্র দিল্লির লালকেল্লাটুকু, তারও নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল ইংরেজরা, অর্থ বলতে ইংরেজদের মঞ্জুর করা বার্ষিক নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাতা।

বাহাদুর শাহ্ জাফরের প্রথম পুত্র মির্জা শাহ্রুখ ১৮৪৭ সালে মারা যান। স্বাভাবিকভাবে বাদশাহ্ তাঁর পরবর্তী পুত্র মির্জা দারা বখ্ত কে উত্তরাধিকারী হিসাবে ভেবেছিলেন। ১৮৪৯ সালে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তিনিও মারা যান। এবার তিনি উত্তরাধিকারী হিসাবে ভেবেছিলেন পরবর্তী জীবিত পুত্র মির্জা ফকরুকে। ফকরুছিলেন বিখ্যাত লিপিকার (Calligrapher) এবং ঐতিহাসিক,

মার্জিত, ভদ্র, শিক্ষিত এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন। কিন্তু বাদশাহ্ ভাবলেই তো সমস্যার সমাধান হচ্ছিল না, পর্দার আড়ালে ভাবছিলেন আরও একজন তিনি বেগম জিনাত মহল, বারবার তিনি বাদশাহ্কে চাপ দিচ্ছিলেন নিজপুত্র জওয়ান বখ্তকে উত্তরাধিকারী হিসাবে বাছাই করার জন্য, ১৮৪৯ সালে মির্জা জওয়ান বখতের বয়স তখন মাত্র ৮ বছর। শুধু তাই নয় সে ছিল পঞ্চদশ পুত্র, তার চেয়ে বড়ো একাধিক পুত্র ছিল বাদশাহ জাফরের। বাদশাহ্ জাফরের বয়স তখন ৭৪ বছর, ২৮ বছরের প্রিয়তমা পত্নীর অনুরোধ [নাকি নির্দেশ? নাকি তা ছিল আদেশ?] প্রত্যাখ্যান করে মির্জা ফাকরুকে বাছাই করার মতো দৃঢ়তা বাহাদুর শাহজাফরের আদৌ ছিল না।

লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে বাদশাহ লিখলেন :

আমার একাধিক পুত্রের মধ্যে মির্জা জওয়ান বখ্ত ছাড়া সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত হিসাবে অন্য কাউকে দেখছি না। একথা জানাতে আমার খুবই আনন্দ হচ্ছে যে তার মধ্যে অনেক সহজাত সুকুমার গুন দেখতে পাই। যদিও এখনও সে সাবালক হয়নি এবং এখনও পর্যন্ত তাঁকে কোনও অসৎ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার সুযোগ দেওয়া হয়নি। তা ছাড়া সে আমার বৈধ পত্নীর গর্ভজাত পুত্র, যে পত্নীর পিতা উচ্চবংশের, ওই পত্নী বেগম জিনাত মহল... সুতরাং সবদিক বিশ্লেষণ করে আমার অবর্তমানে এই মসনদে বসবার পক্ষে সে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। সে সবসময় আমার চোখে চোখে থাকে, সমস্ত সময় সে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার জন্য অনুশীলন করে। এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে কোনও কাজ করে না [বাহাদুর শাহ জাফরের জেমস টমসন কে লেখা চিঠি, তারিখ ১৯/০১/১৮৯৪]।

এ ঘটনা ইতিহসের পুনরাবৃত্তি। কী রকম পুনরাবৃত্তি তা সংক্ষেপে বলা হল—

বাহাদুর শাহ জাফরের পিতা মইনউদ্দিন আকবর (দ্বিতীয়), ১৮০৫ থেকে ১৮৩৭ খ্রি. পর্যন্ত মসনদে ছিলেন, তাঁর দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ বাহাদুর শাহ জাফর এবং কনিষ্ঠ মির্জা জাহাঙ্গির। মির্জা জাহাঙ্গির স্বভাবে ছিলেন উদ্ধত ও 'বেয়াড়া'। অথচ বাদশাহ মইনউদ্দিন আকবর (দ্বিতীয়) চাইছিলেন মির্জা জাহাঙ্গির-ই পরবর্তী বাদশাহ্ হিসাবে মসনদে বসুক। পরিস্থিতি যখন প্রায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল, ২১ মার্চ, ১৮০৭, শাহজাদা জাফর চিঠি লিখলেন তখনকার ইংরেজ রেসিডেন্ট আর্চিবল্দ সেটনকে, আবার জাফরের পিতা জাফর সম্বন্ধে আপত্তি জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন ওই একই সেটনকে। আকবর শাহ (দ্বিতীয়) লিখেছিলেন :

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের [অর্থাৎ জাফর] মসনদে বসবার কোনও যোগ্যতাই নেই। [ডেল: ৪৬]

তথ্য প্রমান ছাড়া বাদশাহ যুবক আবু জাফর সম্বন্ধে অভিযোগ এনেছিলেন। বিয়াল্লিশ বছর বাদে মির্জা ফকরু সম্বন্ধে একই মতামত দিলেন সেই আবু জাফর এবং এক্ষেত্রে মির্জা জওয়ান বখ্‌ত যেন বিয়াল্লিশ বছর আগের মির্জা জাহাঙ্গির। ইংরেজদের সহায়তায় আবু জাফর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'বোয়াড়া' স্বভাবের মির্জা জাহাঙ্গিরকে ইলাহাবাদ দুর্গে নির্বাসনে পাঠানোর বন্দোবস্ত করেন, ওই দুর্গেই ১৮২১ সালে মাত্রাতিরিক্ত Hoffman's Cherry Brandy পান করার কারণে তিনি মারা যান। নির্বাসনে পাঠানোর কারণটিও ছিল চিত্তাকর্ষক।

সেটন দিল্লি থেকে কলকাতায় চিঠিতে লিখলেন :

অত্যন্ত সম্মাননীয় বৈশিষ্টের অধিকারী জাফর, কিন্তু তিনি তাঁর পিতার পছন্দের তালিকার বাইরে, উপেক্ষিত। আকবর শাহ্ মির্জা জাহাঙ্গিরের প্রতি সদয়। [ডেল: ৪৪৮].

সুতরাং এখন বাদশাহ জাফর সেই একই ভূমিকা নিলেন যা তাঁর পিতা নিয়েছিলেন ৪২ বছর আগে। লাগাতার তিনি মির্জা জওয়ান বখ্‌তকে সামনে ঠেলতে লাগলেন। এদিকে মির্জা ফকরু চুপচাপ ছিলেন না। 'তাঁর শ্বশুর মির্জা ইলাহি বক্‌স ছিলেন মারাত্মক উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ইংরেজদের চিনতেন হাড়ে হাড়ে। শ্বশুরের পরামর্শে ফকরু ইংরাজি শিখতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা উভয়েই মেটকাফে এবং দিল্লিস্থিত ইংরেজদের সামরিক আধিকারিকদের তোষামোদ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন। সত্যি বলতে কী শেষ পর্যন্ত তাদের উদ্দেশ্য সফল হল, ১৮৫২ সালের জানুয়ারি মাসে মির্জা ফকরু মেটকাফে এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এ ঘটনা ঘটল মির্জা জওয়ান বখ্‌তের বিবাহের তিন মাস আগে। তাঁরা পরস্পর এক গোপন সমঝোতা পত্রে দস্তখত করলেন : ইংরেজরা বাহাদুর শাহ জাফরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে তাঁকে পরবর্তী মোগল বাদশাহ্ হিসাবে অনুমোদন দেবেন বিনিময়ে তিনিও ইংরেজদের তুল্যমূল্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবেন। কী রকম ক্ষতিপূরণ? দুই শতাব্দী আগে তৈরি দিল্লির লাল কেল্লাটি তিনি ইংরেজদের হাতে তুলে দেবেন সেখানে ইংরেজরা বারুদখানা তৈরি করবে এবং সৈন্যদের থাকবার বন্দোবস্ত করা হবে। এছাড়া ফকরু বাদশাহ্ হওয়ার পর মোগল বাদশাহ্ যে পদমর্যাদা ও সম্মানে ইংরেজগভর্নর জোনারেলের চেয়ে বড়ো, সেই দাবি পরিত্যাগ করবেন। এবং তিনি দরবার সরিয়ে নিয়ে যাবেন দূরবর্তী মেহরৌলি দুর্গে।

সমঝোতা পত্রে স্বাক্ষর গোপনে হলেও গোপন রইল না শর্তাবলি, পৌঁছেগেল বাহাদুর শাহের কানে, তিনি রেগে অগ্নিশর্মা হলেন। তাঁকে দরবারে আসতে নিষেধ করা হল, ঘোষণা করা হল যে বা যারা মির্জা ফকরুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন, শত্রু হিসাবে চিহ্নিত হবেন। দরবারে মির্জা ফকরুর নানা সুবিধা, তাঁর ভাতা, প্রাসাদ, জমি-জমা— এক এক বরে তারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কঠোর পরিশ্রমী, শাহজাদাদের মধ্যে ইংরেজ ভাবাপন্ন মির্জা মুঘলকে দিতে লাগলেন বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফর। এদিকে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে লাগল ইংরেজরা তাঁদের সিদ্ধান্ত বদলাবেন না, ক্রমশ বাহাদুর শাহ জাফরের মন বিষণ্ন হতে লাগল, তিনি অসহায় বোধ করতে লাগলেন, শেষে রীতিমতো হতাশ হয়ে পড়লেন। তিনি ঘোষণা করলেন : যদি তাঁর ইচ্ছা কে উপেক্ষা করা হয়, তিনি অবসর নিয়ে মক্কায় যাবেন।

বিষণ্ণতায় ভরা চিঠি লিখলেন মেটকাফে কে :

খুবই দুঃখের সাথে জানাচ্ছি আমার ইচ্ছার অনুমোদন যদি সরকার না দেয় এই বিষয়ে নিদারুণ মর্মবেদনা অনুভব করব। উদ্বেগের মধ্যে আমি, এবং এই সমস্যাবহুল প্রশাসনে আমার থাকবার দরকার নেই, আমার মক্কায় তীর্থ করতে যাওয়া উচিত। আমার মনে হচ্ছে এই সংসারে আমার প্রয়োজন শেষ হয়েছে। এই বয়সে এই মর্মবেদনা সহ্য করতে পারব না। [ডেলরেম্পল : ৪৭-৪৮]।

এ চিঠির জবাব মেটকাফে কী দেবেন বুঝতে পারছিলেন না, কিন্তু এটা বুঝতে তার অসুবিধা হল না যে আট বছরের শিশুর পিছনে রয়েছেন সম্রাজ্ঞী জিনাত মহল। তিনি কলকাতায় লিখলেন :

যখন বাদশাহের সঙ্গে একাকী মুখোমুখি কথা বলি, তাঁর কথার মধ্যে যুক্তি খুঁজে পাই, তাঁকে বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন মনে হয়। কিন্তু পরে তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেন তাঁর প্রিয়তমা পত্নী নবাব জিনাত মহল এবং তাঁর পত্নীর বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা প্রধান খোজা মাহবুব আলি খান, যিনি বাদশাহকে দিয়ে অনেক যুক্তিহীন কাজ করিয়ে নেন। [সূত্র : স্যার টমাস মেটকাফের থর্নটনকে লেখা চিঠি, তারিখ ৪/১২/১৮৫১]।

স্যার টমাস থিওফিলাস মেটকাফে ৪০টি বছর দিল্লিতে ছিলেন, দিল্লি শহরকে চিনতেন হাতের তালুর মতো, আর চিনতেন শহরের শাসককে। ১৮৫১ সালের পর থেকে তিনি যেন একটু একটু করে অসুস্থ হতে লাগলেন। তাঁর অসুস্থতাও ছিল অদ্ভুত, এমনিতে তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেন, কিন্তু ক্রমশ যেন দুর্বল হতে লাগলেন, যদিও শরীরে না ছিল ব্যথা বা যন্ত্রণা। ৩ নভেম্বর ১৮৫৩ রহস্যময় রোগে মেটকাফে মারা যান। সন্দেহ করা হয় রান্না করা সবজির সঙ্গে

বিষ দেওয়া হয়েছিল, ধীরগতি সম্পন্ন বিষের প্রভাবে তিনি মারা যান। যদিও এর সপক্ষে জোরালো প্রমাণ পাওয়া যাননি। কিন্তু মৃত্যুর আগে তিনি অনুমান করেছিলেন মির্জা ফাকরুও আর বেশিদিন বাঁচবেন না। আড়াই বছর বাদে ১৮৫৬ সালে ১০ জুলাই মির্জা ফকরু মারা যান। যদিও তিনি কলেরায় মারা গিয়েছিলেন তবুও আশঙ্কা করা হয় তাঁকেও ধীরগতি সম্পন্ন বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল। যে বছর স্যার টমাস থিওফিলাস মেটকাফের জীবনাবসান ঘটে, ওই বছরেই শেষ দিকে একইভাবে মৃত্যু ঘটে স্যার হেনরি এলিয়ট এবং টমসনের। এক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট প্রমাণ মেলেনি কিন্তু বাদশাহের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হাকিম আহাসানুল্লা খানের মতে লক্ষণগুলি ছিল বিষ প্রয়োগে মৃত্যুর মতো [ডেলরেম্পল ৪৯, ১১৮-১১৯]।

ফ্রেজার চাকুরি থেকে অবসর নেওয়া ঘোষণা করার দুদিন বাদে সংবাদ এল শাহ্জাদা মির্জা ফকরুর জীবনাবসান ঘটেছে। তিনি সংবাদ পেয়েই কেল্লায় গেলেন, তিনি আশা করেছিলেন পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ বাদশাহ্কে বিষণ্ণ অবস্থায় দেখবেন। ততক্ষণে মেহরৌলিতে সুফি সন্ত্ কুতুব সাহিবের সৌধ প্রাঙ্গনে প্রয়াত শাহ্জাদাকে সমাধিস্থ করা হয়ে গিয়েছিল। শোকাচ্ছন্ন পিতার পরিবর্তে ফ্রেজার দেখলেন একটা চিঠি হাতে নিয়ে বসে রয়েছেন বৃদ্ধ বাদশাহ্, সবে মাত্র চিঠিটি লেখা হয়েছে গভর্ণর জেনারেলকে উদ্দেশ্য করে, বক্তব্য সেই একই, আগের মতো :

মির্জা জওয়ান বখ্ত আমার বৈধ সন্তান, তাঁর মা বেগম জিনাত মহল উচ্চ বংশজাত কন্যা। পিতা হিসাবে বলছি বাদশাহ্ হওয়ার সমস্ত গুন, যোগ্যতা ও লক্ষণ ওর মধ্যে বিদ্যমান। আমার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে ওর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে। ওর সঙ্গে আমার অন্যান্য পুত্রদের কোনও তুলনাই চলে না। একমাত্র ওকেই আমি অনুগ্রহ করি ওর প্রতিভার জন্য। সিংহাসনে বসার ও একমাত্র যোগ্য পুত্র [ডেলরেম্পল : ১২১]

মির্জা ফকরুর মৃত্যুর আট মাস পরে দিল্লিতে বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হল। দিল্লির জামা মসজিদের পিছনে ১৮ মার্চ ১৮৫৭, প্রাচীরের উপর দেখা গেল একটা উন্মুক্ত তরবারি চাপ দেওয়া একটা ময়লা কাগজ রয়েছে। তাতে যেন পারস্যের শাহ এই বলে শপথ নিচ্ছেন যে পারস্যে ইংরেজবাহিণী মারাত্মকভাবে পরাজিত, পারস্যের বাহিণী আফগান সীমান্ত অতিক্রম করেছে, তারা হিন্দুস্থান থেকে খ্রিস্টানদের শাসন শেষ করার লক্ষ্যে হিরাট থেকে যাত্রা করেছে। ওই বার্তা পেয়ে দিল্লিবাসীর মধ্যে অস্থিরতা আরম্ভ হল।

১৮৫৬ সালে মির্জা ফকরু যখন মারা যান সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের বয়স

৮১ বছর। এই সময় বাদশাহের একটাই ইচ্ছা [প্রকৃতপক্ষে প্রিয়তমা পত্নী বেগম জিনাত মহলের ইচ্ছা] শাহ্জাদা মির্জা জওয়ান বখ্তকে মসনদে বসানো। তাঁর মৃত্যুর পর যাতে বেগম জিনাত মহল ও মির্জা জওয়ান বখ্তের আর্থিক কষ্ট না হয় তার জন্য তিনি ডালহৌসির কাছে একের পর কে চিঠি লিখতেন। যে ভাতা ইংরেজ সরকার মঞ্জুর করেছে তাঁর মৃত্যুর পর যেন তাঁর পত্নী ও পুত্রকে দেওয়া হয়, যেন তা বন্ধ না হয়। যেন তাঁর এক এবং একমাত্র পুত্র মির্জা জওয়ান বখ্ত। [ডেলরম্পল : ১২৪]।

১.১০. মির্জা ফকরু এবং মির্জা গালিব ।

শাহ্জাদা মির্জা ফকরুর মৃত্যুতে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছিলেন কবি মির্জা গালিব। ইতিমধ্যে ডালহৌসি অযোধ্যার দখল নিয়েছিলেন এবং মির্জা ফকরুকে ইংরেজ সরকার মেনেও নিয়েছিল, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই স্থির হয়ে যায় মোগল শাহ্জাদাদের 'বাদশাহ' হিসাবে মসনদে বসবার দিন চিরতরে শেষ হয়ে গেল। মির্জা গালিব অযোধ্যার নবাবের কাছ থেকে সামান্য অর্থ পেতেন ভাতা হিসাবে, ইংরেজরা অযোধ্যা গ্রাস করায় তা বন্ধ হয়ে যায়। ২৩/২/১৮৫৬ তারিখে লেখা মির্জা গালিবের চিঠিতে তাঁর আর্থিক কষ্টের কথা প্রকাশ পেয়েছে। আবার ১০/৭/১৮৫৬ তারিখে গালিবের ছাত্র শাহজাদা মির্জা ফকরুর মৃত্যুতে তাঁর আর্থিক সমস্যা আরও উদ্বেগজনক হল। ২৭/৭/১৮৫৬ তারিখে লেখা এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন :

বাদশাহের উত্তরাধিকারীর মৃত্যু আমাকে কঠিনতর সমস্যা ও কষ্টের মধ্যে ফেলেছে। তার মানে বাদশাহি দরবারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নির্ভর করছে বাদশাহ কী করবেন তার উপর। যে আমার প্রতিভার মূল্য দিত, আজ সে মৃত তা হলে আজ কে আমার স্বীকৃতি দেবে? সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস রেখেছি, তাঁর ইচ্ছার উপর সবকিছু সমর্পণ করেছি। তাৎক্ষণিক ভাবে আমার যা ক্ষতি হয়েছে তা হল, আমার দুই দত্তক পুত্রকে ফল কিনে দেওয়ার জন্য শাহ্জাদা মির্জা ফকরু প্রতি মাসে আমায় দশ টাকা করে দিতেন। এখন এই অর্থ আমায় কে দেবে? (গালিব : জীবনী, চিঠি ও গজল, অক্সফোর্ট, নিউদিল্লি, পৃষ্ঠা ১১৩) [ডেল : ১২৯]।

লক্ষণীয় যে ১৮৫৩ সালে ১০ গ্রাম সোনার মূল্য ছিল ১৮ টাকারও কম।

১.১১. শাহ্জাদা মির্জা খিজ্র সুলতান ।

বাহাদুর শাহ জাফরের নবম পুত্র মির্জা খিজ্র সুলতান। এর মা ছিলেন বাদশাহের উপপত্নী রহিম বক্স বাঈ। সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। গালিবের ভাষায় 'ইউসুফের মতো সুন্দর'। সুন্দর কবিতা লিখতেন , ১৮৫২ সালে পিতার কাছে

মেহেরৌলিতে নিজের জন্য একটা বাড়ি এবং একটা হাতি চেয়েছিলেন, তাঁর আবেদন তৎক্ষণাৎ খারিজ করে দিয়েছিলেন বাহাদুর শাহ জাফর। এর কারণও ছিল। মির্জা খিজ্‌রের সাথে মির্জা ফকরুর সখ্যতা সকলেই জানত, এই অন্তরঙ্গতা ছিল তাঁর আবেদন বাতিলের প্রধান কারণ। আবার তাঁর পত্নী এবং মির্জা ফকরুর পত্নী পরস্পর অন্তরঙ্গ ছিলেন। ১৮৫২ সালের অগস্ট মাসে পত্নীকে প্রহার করার অপরাধে প্রকাশ্য দরবারে বাদশাহ তাঁকে ভর্ৎসনা করেন। নিজের দোষ স্বীকার করে পিতার পদতলে পড়ে ক্ষমা চান। ক্রুদ্ধ সম্রাট প্রত্যেকের উপস্থিতিতে দুই তিন চড় মারেন তাঁকে। এর পর তাঁকে ক্ষমাও করেন। প্রয়াত শাহ্‌জাদা মির্জা ফকরুর জ্যেষ্ঠপুত্র মির্জা আবু বক্‌রের সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। সিপাহি বিদ্রোহের সময় আবু বকর সক্রিয় ভাবে অংশ নেন। [ডেলরেম্পল : ২১৫]।

১.১২. মির্জা বখ্‌তওয়ার শাহ ।

বাহাদুর শাহ জাফরের একাদশ পুত্র। এর মা ছিলেন বাদশাহের উপপত্নী হাজওয়া বেগম। সেই কারণে মির্জা বখ্‌তওয়ার সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী ছিলেন না। মির্জা বখ্‌তওয়ার জন্মগ্রহণ করেন ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৫২ সালে মির্জা ফকরুর কন্যার সঙ্গে এর বিবাহ হয়। [সূত্র : সি. অ্যালেনকে লেখা স্যার টমাস মেটকাফের চিঠি, তারিখ ১১/০১/১৮৪৯]।

১.১৩. মির্জা আবদুল্লা।

বাহাদুর শাহ জাফরের পৌত্র, তথা মির্জা শাহরুখের পুত্র, যিনি ১৮৪৭ সালে মারা যান। বাহাদুর শাহ্‌ জাফরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন মির্জা শাহরুখ। পিতার মৃত্যুর পর মির্জা আবদুল্লা এবং তাঁর মা খাইরুম বাঈ তথা মির্জা শাহ্‌রুখের উপপত্নী মক্কায় যান। ১৮৫৩ সালের ডিসেম্বরে তাঁরা হিন্দুস্তানে প্রত্যাবর্তন করেন। পিতামহের কাছ থেকে হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর উপহার হিসাবে পান সাদা রঙের মাদী ঘোড়া (অথবা গাধা)। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের আগে মির্জা আবদুল্লার কোনও খোঁজই ছিল না [ডেলরেম্পল : ২১৬]।

১.১৪. মির্জা মুঘল।

বাহাদুর শাহ জাফরের পঞ্চম পুত্র মির্জা মুঘল। অন্যান্য শাহ্‌জাদাদের থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা সিপাহি বিদ্রোহের চূড়ান্ত পর্বে তিনি সাধারণ প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে দুর্দান্ত দক্ষতা প্রদর্শন করেন। ১৮৫৭ সালে তাঁর বয়স ছিল ২৯ বছর, অর্থাৎ ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ক্ষমতাশালী বিমাতা বেগম জিনাত মহল তাঁর চেয়ে মাত্র ৮ বছরের বড় ছিলেন। তাঁর মা শরাফ উল-মহল সঈদানি ছিলেন অভিজাত পয়গম্বরের বংশের কন্যা।

দরবারের বিভিন্ন নথিপত্রে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের আগে একাধিক জায়গায় মির্জা মুঘলের নাম দেখা যায়, যা অন্যদের ক্ষেত্রে বিরল। নিজস্ব যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের কারণে বাদশাহি দরবারে তাঁর একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছিল। মির্জা ফকরুর পতনের পর যদি একজন উপকৃত হন, তিনি মির্জা মুঘল। ১৮৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে দরবার থেকে ফকরু বহিস্কৃত হওয়ার পর প্রাসাদের প্রভাবশালী 'নাজির' এবং 'কিলাদার'— এই দুই দপ্তরের তিনি দখল পান, এছাড়া প্রাসাদের অর্থ দপ্তরের দায়িত্বও বর্তায় তাঁর উপর। মির্জা ফকরুর জমিজমা ও অন্যান্য আয় তাঁর জিম্মায় যায়। বিমাতা বেগম জিনাত মহলের সঙ্গে সমঝোতা করে তিনি বিস্তর সুবিধা লাভ করেন। মির্জা ফকরুকে প্রতিহত করবার জন্য ধুরন্ধর বেগম জিনাত মহল মির্জা মুঘলকে সামনে নিয়ে আসেন। মির্জা ফকরুর দপ্তর, সম্পদ নিয়ে কোনও সমস্যা হলে মির্জা মুখল জিনাত মহল বেগমের সাথে আলোচনা করতেন, তাঁর পরামর্শ নিতেন।

মির্জা মুঘলের দুটো ছবি পাওয়া যায়। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১০ বছর, ছবিটি আঁকা হয়েছিল বাহাদুর শাহ জাফরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হওয়া উপলক্ষে ১৮৩৭-৩৮ সালে। পরিপূর্ণ দরবারি পোশাকে ছিল বালক মির্জা মুঘল। আর একটি তেলরঙে ছবি আঁকা হয়েছিল সিপাহি বিদ্রোহের কয়েক বছর আগে, ১৮৫০ সালে। চিত্র শিল্পী ছিলেন অগষ্ট সোয়েফ্ট। এই ছবিতে মির্জা মুঘলকে একজন চটপটে, সুন্দর খেলোয়াড় সুলভ তরুণের সাজে দেখাচ্ছে। সাদা রঙের পোশাক পরা, গাঢ় গায়ের ত্বক, চোখ বাদামি, কুচকুচে কালো চাপদাড়ি। সিপাহি বিদ্রোহের সময় মির্জা মুঘলের সক্রিয়তা ছিল উল্লেখযোগ্য। বিদ্রোহ দমন করার পর হাডসন নিজের হাতে তাঁকে গুলি করে হত্যা করে [ডেলরেম্পল : ২১৬-২১৭]।

১.১৫. সিপাহি বিদ্রোহ ও বেগম জিনাত মহল ।

সিপাহি বিদ্রোহের সময় বেশির ভাগ শাহ্জাদাই ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিলেন। অন্যদিকে প্রায় একই কারণে বেগম জিনাতমহল 'তার পুত্র মির্জা জওয়ান বখ্তকে সংঘর্ষ থেকে দূরে রেখেছিলেন। বাহাদুর শাহ জাফরের সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তাভাবনা ছিল জিনাত মহলের। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যুদ্ধে অংশগ্রহণের অর্থ মির্জা জওয়ান বখতের ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক সিদ্ধান্ত।

যেভাবেই হোক জিনাত মহল হিসাব করেছিলেন ইংরেজরা দিল্লিতে ফিরে এসে বিদ্রোহী সিপাইদের উৎখাত করবে। সেক্ষেত্রে ইংরেজদের প্রতি অনুগত থাকবার অর্থ তাঁর পুত্রের মসনদে বসবার পদ্ধতি সহজ হওয়া। যে দিন বিদ্রোহ

প্রকাশ্যে দেখা দিল, তিনি বাহাদুর শাহ্ জাফরকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, ওই রাত্রে দ্রুতগামী উটের মাধ্যমে আগরায় উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গভর্নরকে বার্তা পাঠানো হোক। পরবর্তী ক্ষেত্রে তিনি জওয়ান বখ্তকে বিদ্রোহের কার্যকলাপ থেকে দূরে রাখেন যাতে বিদ্রোহের তাপ পুত্রের গায়ে না পড়ে।

মির্জা মুঘলকে প্রধান সেনাপতি হিসাবে নিয়োগ করে বিদ্রোহীরা, জওয়ান বখ্তকে দেওয়া হয় 'ভজির' পদ, কিন্তু কোনও ভাবেই বেগম জিনাত মহল পুত্রকে প্রশাসনিক কার্যকলাপে যুক্ত করতে দেননি। প্রাসাদেরমধ্যে মা ও পুত্র ছিলেন ইংরেজদের পক্ষে। আর ছিলেন প্রধান খোজা তথা জিনাত মহলে বল ভরসা মহবুব আলি খান, বাদশাহ্ জাফরের প্রধান মন্ত্রী হাকিম আহাসানুল্লাহ খান এবং প্রয়াত শাহ্জাদা মির্জা ফকরুর শ্বশুর মির্জা ইলাহি বক্স। ১৮৫২ সালে মির্জা ইলাহি বক্স এবং বেগম জিনাত মহল পরস্পরের শত্রু ছিল, কিন্তু পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তাঁরা একই নৌকার যাত্রী এখন। আবার মির্জা মুঘল ছিলেন বেগম জিনাত মহলের দিকে, তিনি এখন তাঁর বিপরীত পক্ষে।

পত্নী জিনাত মহল এবং তাঁর পরামর্শদাতাদের থেকে বাদশাহ দূরত্ব রেখে চলছিলেন। অন্যদিকে জিনাত মহল, মাহবুব আলি খান এবং হাকিম আহাসানুল্লাহ খান সরাসরি মির্জা মুঘলের বিরোধিতায় নামলেন। তিনি মির্জা মুঘল ও সিপাইদের বিরোধিতা করুন বা ইংরেজদের সমর্থন করুন, বিদ্রাহ দমন করার পর ইংরেজরা তাঁকে বা তাঁর পুত্র মির্জা জওয়ান বখ্তকে রেহাই দেয়নি। অন্যদের ক্ষেত্রে হত্যা করা হয়েছিল, জওয়ান বখ্ত কে প্রাণে মারেননি ঠিকই কিন্তু রেঙ্গুনে যেভাবে নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয়েছিল তার চেয়ে বুঝি মৃত্যুই ভালো ছিল [ডেল: ২২২]।

রেঙ্গুনের যন্ত্রণাময় দিনগুলি

২.১ মুখবন্ধ।

হিন্দুস্থানে মোগলদের ধারাবাহিক প্রায় দুই শত বছরের শাসন পর্ব অনেক কিছু দিয়েছে। আমার এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সেই বিশাল মোগল বংশের কোনও বংশধর কি আজ বেঁচে আছেন, তা উদ্ঘাটন করা নিয়ে। যদি থাকেন কীভাবে আছেন? তবে বর্তমানকে বুঝতে গেলে অতীতের সাহায্য নিতেই হবে, তা না হলে বর্তমানকে সঠিকভাবে বোঝা যায় না। এই কারণে বাহাদুর শাহ জাফর, সিপাহি বিদ্রোহ, বেগম জিনাত মহল ইত্যাদি বিভিন্ন প্রসঙ্গগুলির সঙ্গে পাঠকের একটু পরিচয় করানো হয়েছে। এখন হিন্দুস্থানে মোগল পরিবারের তিনটি শাখার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, হয়তো তার চেয়েও বেশি থাকার সম্ভাবনা আছে। সেই যে মির্জা খোয়ায়েশ এক শিখ সৈনিকের বদান্যতায় যে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল, রাজস্থানের উদয়পুরে গিয়ে যার পরিচয় হয়েছিল 'মিঞাঁ সাহিব', তাঁর বংশের অস্তিত্ব জানা গিয়েছে, সে বর্ণনা দেব পরে। মির্জা ফকরু, যিনি রহস্যজনকভাবে মারা যান, তাঁর বংশ শোনা যায় দিল্লিতে বসবাস করছে এবং মির্জা জওয়ান বখ্ত, যাঁকে ইংরেজরা নির্বাসনে পাঠিয়েছিল রেঙ্গুনে, তাঁর বংশধরগণ বেশির ভাগ রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া ও কলিকাতায়, আর রয়েছেন মুম্বাইতে। প্রথমে মির্জা জওয়ান বখ্তের পরিবারের বর্তমান অবস্থার বিবরণ দেব। তার অগে দেখা যাক কীভাবে রেঙ্গুন থেকে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে উপস্থিত হলেন।

২.২ রেঙ্গুনে শাহ্জাদা মির্জা জওয়ান বখ্ত এবং তাঁর পত্নী।

১৮৬২ সালের ৭ নভেম্বর শুক্রবার ভোর পাঁচটায় শেষ মোগল সম্রাট শাহ জাফর মারা যান। ওই দিন বিকাল ৪টের সময় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। সমাধি দেওয়ার সময় পুত্র মির্জা জওয়ান বখ্তসহ মাত্র কয়েকজন কে উপস্থিত থাকার অনুমতি দিয়েছিল ইংরেজ প্রশাসন। ক্যাপ্টেন নেলসনের বাংলোর যে জরাজীর্ণ ঘরে তাঁকে বন্দি রাখা হয়েছিল তার পিছনে সমাধি দেওয়া হয়। জায়গাটি এখন ৬ নং থিয়েটার রোড, রেঙ্গুন নামে পরিচিত।

বাহাদুর শাহ জাফরের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর ইংরেজ প্রশাসন বন্দিদের উপর বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিল করে। চার দেওয়ালের বন্দি জীবন থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। বলা হয় সেনানিবাস এলাকার মধ্যে যে কোনও জায়গায় তাঁরা থাকতে পারবেন। যে ভাতা ১৮৭০ সালে তাঁদের দেওয়া হত তা ছিল অতি নগণ্য এবং চরম দুর্দশার মধ্যে তাদের জীবন কাটাতে হত। ওই সময় মা বেগম জিনাত মহলের সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতেন শাহ্জাদা মির্জা জওয়ান বখ্ত এবং তাঁর পত্নী নবাব শাহ জমানি বেগম। 'বস্তুত তাঁদের অবস্থা ছিল মারাত্মক শোচনীয়... যেখানে তাঁরা থাকতেন সেটাকে বাড়ি না বলে ঝুপড়ি বলাই যুক্তিযুক্ত। যে কিশোরী নবাব শাহ জমানি বেগম হাতির পিঠে বসে দিল্লির রাজপথে বিবাহ করতে গিয়েছিলেন মির্জা জওয়ান বখ্তকে, পিতার আদরে তিনি বড়ো হয়েছিলেন। আজ তিনি হতাশ, হতাশায় ভুগে ভুগে শারীরিকভাবে অসুস্থ। ধীরে ধীরে জমানি বেগম অন্ধ হয়ে গেলেন।

আর একটি বাড়িতে উঠে গেলেন জওয়ান বখ্ত তাঁর পত্নীকে নিয়ে, রেঙ্গুনে কারাগারের কাছে ছিল নতুন বাসস্থান। আশা করেছিলেন হয়তো নতুন পরিবেশে তিনি সুস্থ থাকবেন। বাস্তবে তা হয়নি। যে ভাতা ইংরেজদের পক্ষ থেকে দেওয়া হতো তার বেশির ভাগই জওয়ান বখ্ত ব্যয় করতেন মদের পিছনে। এর ফলে দুর্দশা হ্রাস পাওয়া তো দূরের কথা দিন দিন বাড়তে লাগল! রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় পাঠানো বিভিন্ন প্রতিবেদনে জানা যায়, 'যে ভাতা তাঁদের দেওয়া হয় তাঁর পরিবারের প্রকৃত খরচ মেটানোর পক্ষে তা যথেষ্ট। জওয়ান বখ্ত বেহিসাবি খরচ করতেন, মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানের পিছনে অর্থ ব্যয় করতেন, এই অর্থ অপচয়ে বেশি কষ্ট ভোগ করতেন তার অন্ধপত্নী এবং সরল, সহজ, নিষ্পাপ ছোটো ছোটো সন্তানেরা। এক বার তাঁর পত্নী নিজের পোশাক ও অলংকার বন্ধক দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করেন এবং তা দিয়ে নিজের এবং সন্তানদের জন্য খাদ্য কেনেন। অন্য দিকে জওয়ান বখ্ত ডুবে থাকতেন আকণ্ঠ মদ পান করে। যে ভাতা তিনি পেতেন তার বেশির ভাগই খরচ হত নেশাতে, পাণীয় কিনতে। এসব নিয়ে বলতে গেলে অসভ্যাচরণ করতেন, স্ত্রী কে নির্যাতন করতেন [ডেলরেম্পল : ৪৮০].

১৮৭২ সাল নাগাদ নবাব শাহ জমানি বেগম 'সম্পূর্ণ অন্ধ এবং অসহায় হয়ে পড়লেন... বাস্তবিক এই নারীর আচার ব্যবহার অনুকরণযোগ্য। যে দুর্দশার মধ্যে তাঁকে পড়তে হয়েছিল, তার জন্য তিনি আদৌ দায়ী ছিলেন না। শেষ দিকে তাঁকে

সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হত স্বামীর উপর, তখন তিনি তো অন্ধ। এই সময় মির্জা জওয়ান বখ্‌তের অবস্থার কিছুটা যেন উন্নতি হয়েছিল। তাঁর পত্নী তখন অনুকম্পার পাত্রী। পদমর্যাদায় তিনি নুরজাহান বেগম বা শাহজাহান পত্নী মমতাজ মহল বেগমের সমান, আর্থিক অনটন, স্বদেশ ত্যাগের, যন্ত্রণা , প্রিয়জনদের থেকে বিচ্ছেদ, সব মিলিয়ে হতাশার দুড়ান্ত পর্যায়ে ছিলেন স্বামী-স্ত্রী দুজনেই।

২.৩. মির্জা শাহ আব্বাস।

রেঙ্গুনে নির্বাসিত হয়েছিলেন বাহাদুর শাহ জাফরের আর এক পুত্র শাহ্‌জাদা মির্জা শাহ্ আব্বাস। তিনি ছিলেন বাহাদুর শাহ্ জাফরের উপপত্নীর গর্ভজাত পুত্র, বাহাদুর শাহ্ জাফর তাঁকে খুবই ভালোবাসতেন। তিনি রেঙ্গুনের এক ব্যবসায়ীর কন্যাকে বিবাহ করেন এর ফলে যে আর্থিক সমস্যার কারণে জওয়ান বখ্‌ত শেষ হচ্ছিলেন, অন্তত, শাহ আব্বাসকে সেই কষ্ট ভোগ করতে হয়নি। তাঁর বংশধরগণ এখনও রেঙ্গুনে বাস করছেন।

মির্জা শাহ আব্বাস ছিলেন বাহাদুর শাহ জাফরের কণিষ্ঠতম তথা ষোড়শ পুত্র, মির্জা শাহ আব্বাস জন্মগ্রহণ করেন ১৮৪৫সালে। তখন বাদশাহ জাফরের বয়স ছিল ৭০ বছর। অর্থাৎ দিল্লি ছাড়বার সময় তাঁর বয়স ছিল ১৩ বছরের কিছু বেশি, তাঁর মা ছিলেন বাদশাহের উপপত্নী মুবারক উন্নিসা [ডেলরেম্পল : ৪৫]।

রেঙ্গুনে বন্দি বাদশাহ এবং তাঁর পরিবারের জন্য ১৬ ফুট বর্গ মাপের (১৬ ফুট × ১৬ ফুট) ৪টি ঘর দেওয়া হয়েছিল। তাঁর একটিতে থাকতেন বন্দি বাদশাহ, দ্বিতীয়টিতে থাকতেন শাহ্‌জাদা মির্জা জওয়ান বখ্‌ত, তখন তার বয়স ১৭ বছর এবং তাঁর কিশোরী পত্নী নবাব শাহ জমানি বেগম, তৃতীয়টিতে থাকতেন বেগম জিনাত মহল এবং চতুর্থ ঘরে থাকতেন মাকে নিয়ে শাহজাদা মির্জা শাহ্ আব্বাস। প্রতিটি ঘরের সঙ্গে ছিল অলাদা আলাদা শৌচাগার [ডেল: ৪৬৫]।

যে সময় মির্জা শাহ্ আব্বাসকে রেঙ্গুনে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল তিনি এবং জওয়ান বখ্‌ত দুজনে বেশ স্বাস্থ্যবান, তরজাতা ছিলেন। বংশ মর্যাদায় যেহেতু শাহ্ আব্বাস অপেক্ষাকৃত পিছিয়েছিলেন (মা উপপত্নী) তিনি একটু নিজেকে গুটিয়ে রাখতেন, অন্যদিকে মির্জা জওয়ান বখ্‌ত তাঁর আচার ব্যবহারে ছিলেন সপ্রতিভ। দুজনেই ছিলেন নির্দোষ, নিষ্পাপ। কিছু ফারসি অক্ষর তাঁরা লিখতে পড়তে জানতেন, জ্ঞানছিল সাধারণ বিষয়ের উপর, গভীর কোনও তত্ত্ব তাদের কাছে অজানা ছিল, এমনকী নিজেদের দেশের সীমানা কোথায় তাও তারা জানতেন না। [ডেল: ৪৬৯]।

তাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন নেলসন ডেভিস। ডেভিসের কাছে তাঁরা বারবার ইংরাজি শেখানোর আবেদন জানাতেন, এমনকী দিল্লিস্থিত কমিশনারের কাছে আবেদন পাঠানোর অনুরোধ করেন তাদের রেঙ্গুন থেকে সরিয়ে লণ্ডন বা অন্য কোথাও পাঠানোর জন্য। বাহাদুর শাহ জাফর, বেগম জিনাত মহল এবং মুবারক উন্নিসা প্রত্যেকেই নেলসন ডেভিসের কাছে ওই অনুরোধ করতেন, তাঁরা আশায় ছিলেন হয়তো সে অনুরোধ রাখা হবে। খুব কাছ থেকে ক্যাপ্টেন নেলসন ডেভিস দুই শাহ্জাদাকে দেখেছিলেন, তাঁর মতে দুই জনই যথেষ্ট বুদ্ধিমান, শেখায় আগ্রহী ছিলেন, দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছিল পড়াশোনার। নেলসন ডেভিস কথা দিয়েছিলেন তাঁদের ইচ্ছা সরকারের কাছে পাঠাবেন বলে। ডেভিস কথা রেখেছিলেন, তিনি তাঁর প্রস্তাবে জানান, 'এই দুই শাহ্জাদাকে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে 'ইংরেজ-মোগল' শাহাজাদাতে পরিবর্তন করা যায়। তাদের পিতামাতাও প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন এবং তাদের আশীর্বাদ করেছেন।' বাহাদুর শাহ জাফর এবং তাঁর দুই পত্নী বার বার ওই বিষয়টি নেলসন ডেভিসের সাথে আলোচনা করতেন, অনুরোধ করতেন কার্যকর করবার জন্য। মহারাজা রণজিৎ সিংহের পুত্র দলীপ সিংহকে ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়েছিল, সে উদাহরণও দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন নেলসন ডেভিস, কিন্তু কলকাতাস্থিত তাঁর উর্ধতন কর্তৃপক্ষ পত্রপাঠ তাঁর প্রস্তাব খারিজ করে দেন। ওই চিঠিতে ডেভিস বাহাদুর শাহ জাফর ও অন্যান্যদের সম্পর্কে 'প্রাক্তন বাদশাহ্', 'মহামান্য প্রাক্তন বাদশাহি পরিবার', 'সম্মাননীয়া বেগম' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। ওই চিঠি লেখার পর ডেভিসকে সতর্ক করা হয়, বলা হয় ভবিষ্যতে কোনও চিঠিতে 'দিল্লির রাজবন্দি' ছাড়া অন্য কোনও বিশেষণ যেন বন্দিদের সম্পর্কে তিনি ব্যবহার না করেন। রেঙ্গুনে নির্বাসনে পাঠিয়ে কলিকাতাস্থিত ইংরেজ প্রশাসন সমস্ত দায় কাঁধ থেকে নামিয়ে দেয়, অন্য কোনও রকম দায়িত্ব নিতে তারা সামান্যতম আগ্রহ দেখায়নি। এর ফলে শাহ আব্বাস এবং জওয়ান বখ্তের শিক্ষা বিষয়ে নজর দেওয়া ছাড়া ক্যাপ্টেন ডেভিসের আর কিছু করার রইল না। তাঁরা নিয়মিত ডেভিসের গৃহে যেতেন এবং ইংরাজি শিখতেন, তাঁদের ইংরাজি শিক্ষার অগ্রগতি ভালোই হচ্ছিল। ডেভিসের ভাষায়, 'তারা যে বৈচিত্রহীন জীবন কাটাচ্ছিলেন, তার মধ্যে দিয়ে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা, শেখা সত্যিই খুব কঠিন কাজ।' [ডেল: ৪৭২]

মাঝে মাঝেই দুই কিশোর ডেভিসের পত্নীর সঙ্গে তাদের যন্ত্রণাময় দুঃখের কথা

বলত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সামনে থাকত শাহ্ আব্বাস, পড়ার প্রতি তার মনোযোগ ছিল বেশি। শাহ্ আব্বাসের তুলনায় জওয়ান বখ্ত ইউরোপীয়দের সম্পর্কে বেশি বিরূপ ছিল। মাঝে মাঝে ইউরোপীয় সৈন্যদের সঙ্গে তারা কথা বলত।

শাহ আব্বাস ও জওয়ান বখ্ত সম্পর্কে ক্যাপ্টেন নেলসন ডেভিস লিখেছেন :

'শাহ্ আব্বাসের এই বুদ্ধি আছে যে পরিস্থিতি অনুযায়ী নিয়ম মানতে হবে, অনুশাসন অনুযায়ী চলতে হবে। খুশি মনে সে এ গুলিকে মেনে নিয়েছে এবং সাধারণত, একজন রক্ষী নিয়ে প্রতিদিন সকালে সে বাগানে হাঁটে। মির্জা জওয়ান বখ্ত বোধ হয় মনে করে, যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা নিকৃষ্ঠতম যে কারণে সে কোথাও যেতে চায় না, এমনকী শেষ দুমাসে ওকে পায়চারী করতেও দেখেনি। ও রকম যদি চলতে থাকে শরীরের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর হবে। তবে ভবিষ্যতে তার মনে যে এর চেয়ে ভালো হবে সে ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

২.৪. নবাব শাহ জমানি বেগম সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন ডেভিসের মতামত।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে জমানি বেগমের বয়স যখন মাত্র ১৬ বছর তিনি রেঙ্গুনে এসেছিলেন। জওয়ান বখ্তের পত্নী সম্পর্কে ডেভিস লিখেছেন :

'সুশ্রী চেহারার যুবতী, সম্ভবত, বয়স পনেরোর বেশি হবে না। ইতিমধ্যেই সে দু-দুটি সন্তানের মা হয়েছে। এই বন্দিজীবনকে যে মেনে নিতে হবে অন্যদের তুলনায় সে যেন বেশি করে বুঝেছে। হয়তো এটা সম্ভব হয়েছে তার চমৎকার স্বাস্থ্যের জন্য। আমি লেফটেন্যান্ট ওমানির কাছ থেকে জেনেছি তার একটি পুত্র সন্তান এবং আর একটি জমানোর অপেক্ষায়। বৃদ্ধ বাদশাহ এবং তাঁর পুত্রবধূ ছোটোখাটো কোনও সমস্যা হলেই চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করতে পছন্দ করে।'

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৮৭২ সালে সেই সুন্দর, সুশ্রী চেহারার নিষ্পাপ কিশোরীটি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ত্রিশ বছর। ইতিহাসের চূড়ান্ত ট্র্যাজেডি এই, যে পরিবারের রান্নাঘরে একসময় প্রতিদিন শতাধিক পদ রান্না হত, যা খোলা থাকত সূর্যোদয় থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত, খাদ্যের অভাবে অন্ধ হতে হল সেই পরিবারের বধূকে!

২.৫. রেঙ্গুনে বেগম জিনাত মহল।

রেঙ্গুনে প্রবল ক্ষমতাশালী বেগম জিনাত মহলের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল ১৬ ফুট × ১৬ ফুট মাপের একটা ঘর, ঘর সংলগ্ন শৌচাগার। রেঙ্গুনে যাওয়ার পর বাহাদুরশাহ জাফরের দ্রুত স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে শেষে ১৮৬২ সালের

৭ নভেম্বর ৮৭ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই সময় জিনাত মহলের বয়স ছিল ৪২ বছর।

ক্যাপ্টেন নেলসন ডেভিস কখনও বেগম জিনাত মহলকে দেখেননি, তিনি পর্দানসীন থাকতেন। তাঁর সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে, কোনও জিনিসের প্রয়োজন আছে কি না জানতে তিনি তাঁর স্ত্রী মিসেস ডেভিসকে পাঠাতেন। তিনি মাঝে মাঝে দুই বন্দিনীকে দেখতে যেতেন। বেগম জিনাত মহল সম্পর্কে ক্যাপ্টেন নেলসন ডেভিস লিখেছেন :

তিনি মধ্য বয়সের মহিলা। শরীর স্বাস্থ্যের অবস্থা ভালো। পর্দার আড়ালে সঙ্গে থেকে আমি অনেকবার আমার স্ত্রীর সাথে তাঁর কথোপকথন শুনেছি। দিল্লিতে সিপাহি বিদ্রোহের সময় তিনি আগরাস্থিত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে লেফটেন্যন্ট গভর্নর সি. কলভিনকে যে চিঠি লিখেছিলেন সে কথা বারবার বলতে শুনেছি। সেই চিঠিতে তিনি মি. কলভিনকে দিল্লিতে এসে তাঁদের সাহায্য করবার জন্য আবেদন করেছিলেন। তিনি বারবার বলতেন ইউরোপীয় মেয়েদের তিনি রক্ষা করতে পারেননি, তিনি অসহায় ছিলেন, বরং বিদ্রোহীদের দয়ার উপরে টিকে ছিল বাদশাহি পরিবার।

মেজর হাডসন লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিগত অলংকার, অর্থ ও অন্যান্য সম্পদ তিনি রক্ষা করতে পারেন নি, হাডসন বেঁচে থাকাবস্থায় তাঁর ওই সম্পদ নিয়ে কোনও সমস্যা হয়নি যে, প্রতিশ্রুতিপত্র হাডসন তাঁকে দিয়েচিলেন হাডসনের মৃত্যুর পর তা চাওয়া হয়। এরপর দিল্লির কমিশনার মিষ্টার স্যান্ডার্স ওই সম্পত্তির অধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেন। তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ২০,০০,০০০ (কুড়ি লক্ষ) টাকা, সেই অঙ্গীকার পত্রটি তিনি আর ফেরত পান নি।

তাঁকে জানালাম যেহেতু তাঁর স্বামী বিদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত, তাঁর সমস্ত সম্পদ ওই কারণে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

বাহাদুর শাহ্ জাফরের মৃত্যুর পর মৃতদেহ দেখতে দেওয়া হয়নি জিনাত মহল বা তার অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের।

ধীরে ধীরে জিনাত মহল নিঃসঙ্গ হতে থাকেন। খরচ করতেন খুব হিসাব করে, যেটা না হলে নয়। ...থাকতেন নিজের কেনা একটা কাঠের বাড়িতে... দুই কি তিনজন পরিচারিকা ছিল তাঁর সঙ্গে। অবসরকালীন জীবন যাপন করতেন, কিন্তু বংশ মর্যাদাবোধ ছিল প্রগাঢ়।

শেষ দিকে বিলাসিতার মধ্যে ছিল আফিম সেবন। দিন দিন আফিমের মাত্রা বাড়িয়ে তীব্র নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং ১৮৮২ সালে, বাহাদুর শাহ জাফরের মৃত্যুর ২০ বছর বাদে ৬২ বছর বয়সে মারা যান।

বাহাদুর শাহ জাফরের সমাধির পাশেই তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়েছিল। শেষ দিকে তিনি একবার এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন তাঁকে হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া হোক, তিনি পুত্রের বিরুদ্ধে নির্যাতন করার অভিযোগ করেন ওই চিঠিতে। কিন্তু তাঁর আবেদন নামঞ্জুর হয়।

২.৬. মির্জা জওয়ান বখ্‌তের মৃত্যু ।

১৮৮২ সালে মা বেগম জিনাত মহলের মৃত্যুর দুবছর বাদে মারাত্মক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শাহ্‌জাদা মির্জা শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ৪২ বছর। প্রয়াত মায়ের সমাধির পাশেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

২.৭. শাহ্‌জাদা মির্জা জামশেদ বখ্‌ত ।

শাহ্‌জাদা মির্জা জওয়ান বখ্‌ত এবং নবাব শাহ জমানি বেগমের এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তান জন্মায়। পুত্রের নাম রাখা মির্জা জামশেদ বখ্‌ত এবং কন্যা রৌনক বেগম, তাদের সঠিক জন্ম তারিখ সম্বন্ধে কোনও প্রামাণ্য নথি পাওয়া যায় না।

জামশেদ বখ্‌ত কীভাবে রেঙ্গুনে জীবন যাপন করতেন সে বিষয়েও স্পষ্ট ছবি মেলে না, তবে তাঁর একপুত্র বেদার বখ্‌ত তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা ও অন্যান্যদের সম্বন্ধে খুব সংক্ষিপ্ত তথ্য নথিভুক্ত করেছিলেন, সেই সংক্ষিপ্ত অথচ মুলবান তথ্যটির অনুবাদ লিপিবদ্ধ করা হল :

১৮৫৭ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত মোগল পরিবারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৮৫৮ সাল থেকে ১৮৬৬ সাল (প্রকৃতপক্ষে ১৮৬২ পর্যন্ত) রেঙ্গুনে নির্বাসিত থাকবার সময় দুই খণ্ডে প্রচুর কবিতা রচনা করেন বাহাদুর শাহ, আর ছিল হিন্দুস্থানে যে সমস্ত মোগল বাদশাহগণ রাজত্ব করেন তাঁদের জীবনী, ৫টি রোজ নামচার খাতা, এছাড়া তিনি তাঁর প্রিয় পুত্র শাহ্‌জাদা জওয়ান বখ্‌ত বাহাদুরকে যে সব চিঠি লিখতেন তার একটা প্রতিলিপি, এসব জিনিসপত্র রাখা-ছিল। তথাকথিত যে 'বিচারসভা' ১৮৫৮ সালে লাল কেল্লায় বসেছিল, সেই সময় থেকে সামরিক আদালত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, পিতা বাহাদুর শাহ এবং পুত্র জওয়ান বখ্‌তকে একই কারাকক্ষে রাখা হবে না। মৃত্যুর কিছুদিন আগে বাহাদুর শাহ জাফর তাঁর শেষ অনুরোধ করেন, তিনি পুত্র জওয়ান বখ্‌তকে একবার দেখতে চান, কিন্তু রেঙ্গুনের

ইংরেজ চিফ কমিশনার 'তার অনুরোধ নামঞ্জুর করেন, এমনকী তাঁর মৃত্যুর পরও শাহজাদাকে পিতার সমাধি দেওয়ার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে অনুমতি দেওয়া হয়নি। যে সমাধি দেওয়া হয়েছিল অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে।

লক্ষণীয় যে বাহাদুর শাহ (দ্বিতীয়)য়ের মৃত্যু সংবাদ কর্তৃপক্ষ সরকারিভাবে দুদিন পর ঘোষণা করেছিল এবং মৃতদেহের পাশে প্রার্থনা করার জন্য কোনও মুসলমান ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিকে যাওয়ার অনুমতিও দেওয়া হয়নি। মুসলিম অনুশাসন অনুযায়ী অন্তত ৪ জন মুসলিম ব্যক্তি মৃতদেহ কাঁধে করে নিয়ে যাওয়াই রীতি, কিন্তু সেই অনুশাসন ভেঙে হাকিম মুজাফি এবং হাফিজ মুহম্মদ ইব্রাহিম নামে দুজন মাত্র মুসলিম ব্যক্তি ইংরেজ রক্ষীদের সহায়তায় কারা প্রাঙ্গনের সমাধির মধ্যে ১৮৬৬ সালে ৭ নভেম্বর রাত্রে [সঠিক তারিখ ৭।১১।১৮৬২] তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। রেঙ্গুনের মুসলিমগণ যখন বাহাদুর শাহজাফরের মৃত্যু সংবাদ এবং গোপনে তাঁর সমাধি দেওযার কথা শুনল, হাজার হাজার মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষ বাহাদুর শাহ জাফরের সমাধির কাছে মিলিত হল এবং সমাধি স্থলে প্রবেশ করে প্রথামাফিক প্রার্থনা করতে চাইল। কিন্তু তাদের কে লাঠি প্রয়োগ করে হঠিয়ে দেওয়া হল। ক্যাপ্টেন নেলসন (ডেভিস) এবং ২৫০ জন শ্বেতাঙ্গ রক্ষী সমবেত জনতার দিকে তেড়ে যায়। নেলসনকে নির্বাসিত বাহাদুরশাহের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য স্থায়ীভাবে কারা প্রাঙ্গনে নিযুক্ত করা হয়েছিল। নির্বাসিত বাহাদুর শাহর সঙ্গে যারা সাক্ষাৎ করতে আসত তাদের চিরুণি তল্লাশি করতেন এই নেলসন ডেভিস।

এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পর শাহজাদা জওয়ান বখ্‌তের মা 'জিনাত মহল বেগম' স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়াত বাদশাহের সমাধির উপর একটি স্মৃতি সৌধ নির্মাণের জন্য অনুরোধ করেন। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক রেঙ্গুনস্থ মুসলিম লোকজন আসে এবং তার ফলে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে, এই অজুহাতে কর্তৃপক্ষ ওই অনুরোধ বাতিল করেন। রেঙ্গুনের মুসলিম জনগণ বাহাদুর শাহকে অনন্য সাধারণ সন্ত হিসাবে শ্রদ্ধা করতেন।

সমাধিস্থ করবার দ্বিতীয় দিনে স্থানীয় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এই মর্মে আদেশ জারি করে যে বাহাদুর শাহ জাফরের সমাধিস্থলে কোনও মোমবাতি বা প্রদীপ জ্বালানো যাবে না এবং বাহাদুর শাহ জাফরের সমাধি দেখবার জন্য যে সমস্ত লোক চেষ্টা করবে তাদের তাড়ানোর জন্য ১২ জন স্থায়ী নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করা হয়েছিল।

ওই একই কারাগারে [পৃথক কক্ষে] সম্রাজ্ঞী জিনাত মহল একাকী থাকতেন

তাঁর পৌত্র শাহজাদা জামশেদ বখ্‌ত এবং পৌত্রী শাহ্‌জাদি রৌনক জমানি প্রকৃতপক্ষে বেগমের সঙ্গে ১৮৮৬ সাল [সাল১৮৮২] পর্যন্ত।

১৮৮৬ সালে তাঁর মৃত্যুর আগে [জিনাত বেগম মারা যান ১৮৮২ সালে] আর এক মর্মান্তিক বেদনা সহ্য করতে হয়, তাঁর একমাত্র পুত্র শাহজাদা জওয়ান বখ্‌ত মৌলমিন কারাগারে ১৮৮২ সালে মারা যান।[১] পুত্রের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ানুষ্ঠানে যোগ দিতে অনুমতি দেওয়া হয়নি তাঁকে। বাহাদুর শাহ জাফরের মতো মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। জওয়ান বখ্‌তের মৃত্যুর পরেও ঠিক তাঁর প্রয়াত পিতার ক্ষেত্রে যা করা হয়েছিল, দুদিন পর্যন্ত ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখে। অবশ্য 'জিনাত মহল' মারা গেলে তাঁর মৃতদেহ প্রয়াত স্বামীর সমাধির পাশে সমাধি দেওয়ার অনুমতি দেয় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ।

১৮৮৬ সালে ১৭ জুলাই[১] জিনাত মহল মারা গেলে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা প্রয়াত শাহ্‌জাদা জামশেদ বখ্‌ত এবং তাঁর ভগিনী রৌনক জমানি বেগমকে নির্দেশ দেওয়া হল খুব তাড়াতাড়ি তাঁদেরকে কমিশনার রোডের পাশে একটি ঝুপড়িতে সরিয়ে নেওয়া হবে এবং প্রতিমাসে তাঁদের ৫০০ টাকা হারে ভাতা এবং একটি সরকারি বাড়ি দেওয়া হবে।

এই সময় আমার পিতার বয়স ছিল ৩২ বছর[২], এই সময় শহরে ঘুরে বেড়ানো বিষয়ে আমার পিতার উপর থেকে কিছু বিধি নিষেধ শিথিল করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে স্পষ্ট বলা হয়েছিল প্রতিদিন তিনি শহরের কোথায় কোথায় যাবেন তা প্রতিদিনই রেঙ্গুন শহরের পুলিশ কমিশনারকে জানাবেন। বিধি নিষেধ কিছুটা শিথিল হওয়ার পর পরই আমার শ্রদ্ধেয় পিতা শাহজাদা জামশেদ বখত তাঁর পিতা প্রয়াত মির্জা জওয়ান বখতের সমাধি দেখতে ছুটে যান এবং সেখানে ৩ দিন ৩ রাত কাঁদতে থাকেন এর পর রেঙ্গুনে তাঁর ছোট্ট ঘরে ফিরে এসে প্রচণ্ড মানসিক দুঃখে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

আমার স্বনামধন্য শ্রদ্ধেয় পিতা শাহ্‌জাদা জামশেদ বখ্‌ত বাহাদুর শাহ জাফরের লেখা কয়েকটি কবিতা অমুদ্রিত বই থেকে সংগ্রহ করে রেঙ্গুনের এক উর্দু প্রেসে প্রকাশ করার জন্য দিয়েছিলেন এবং রেঙ্গুনের 'রাওয়াল (Rawwal) গায়কদের কাছে দিয়েছিলেন 'রাওয়ালি' গান করবার জন্য। এই ঘটনা ঘটেছিল ১৯০৯ সালে। সংবাদ জানাজানি হতেই কর্তৃপক্ষ দ্রুত গতিতে এই মর্মে নির্দেশ জারি করেন যে বাহাদুর শাহ জাফরের কবিতা প্রকাশের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি

হয়েছে এবং বাহাদুর শাহ জাফরের কবিতা যাতে সংগীত ('রাওয়ালি') হিসাবে গাওয়া না হয় সে ব্যাপারে রেঙ্গুনের রাওয়ালদের সতর্ক করা হল।

১৯২১ সালের ২১ জুন আমার পিতা মারা যান। তিনি ইংরাজি, আরবি এবং ফারসি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। হিন্দুস্থানি এবং বর্মার মুসলিমদের এক বৃহত্তর অংশ চেয়েছিল আমার পিতাকে তাঁর পিতামহ বাহাদুর শাহ জাফরের সমাধির পাশে কবর দেওয়া হোক, কিন্তু ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তা অগ্রাহ্য করে এবং 'টম্বোই' (Tomboi) নামক স্থানে সাধারণ সমাধি প্রাঙ্গনে তাঁকে সমাধি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আমার পিতার মৃত্যুর মাত্র ৬ মাস পর আমার মা নবাব নাদির জাহান বেগম মারা গেলেন, তাঁকেও 'টম্বোই'য়ের সাধারণ গোরস্থানে সমাধি দেওয়া হয়েছিল।[৩]

আমার পিতার মৃত্যুর পর তখনকার রেঙ্গুনস্থ পুলিশ কমিশনার মি. ম্যাঙ্গল ২৭।৭।১৯২১ তারিখে[৪] পিতার ঘরে অনুসন্ধান চালান এবং সমস্ত মূল্যবান জিনিসপত্র, পাণ্ডুলিপি, গুরুত্বপূর্ণ স্মারক এবং ঐতিহাসিক উষ্ণীষ দখল করে নিয়ে যান, বলা হয় যেহেতু আমি নাবালক সেইজন্য নিরাপদে রাখবার জন্য পুলিশ সে গুলিত দখল নিল আরও বলা হল আমাকে সরকারি ঘর খালি করে দিতে হবে। তখন আমার মাতামহ নবাব পিয়ারে মির্জা আমায় নিয়ে রেঙ্গুনের বিখ্যাত আইনজীবী মিষ্টার আর. এস. জেইলয়ের কাছে যান। আমার পক্ষে তিনি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ আরম্ভ করলেন এবং ১৯২২ সালের ৫ জানুয়ারি এক আদেশ বলে রাজনৈতিক ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তবে মত দেওয়া হয়েছিল, যখন আমার বয়স কুড়ি বছর পূর্ণ হবে ওই ভাতা দেওয়া বন্ধ করা হবে। ঠিক এই রকম সংকটাপন্ন সময়ে ১৯২১ সালের ১ ডিসেম্বর 'রেঙ্গুন ডেইলি নিউজ' পত্রিকায় একটা সংবাদ প্রকাশ হয়। প্রায় একই সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তখনকার সভাপতি সম্মাননীয় হাকিম আজমলখান আমার দিল্লিতে যেতে আমন্ত্রণ জানান। এই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আমার মাতামহ নবাব পিয়ারে মির্জা আমায় কলকাতা হয়ে দিল্লিতে নিয়ে আসেন।

বেশ কিছুদিন হাকিম আজমল খানের গৃহে থাকবার পর ১৯২৬ সালে আমাকে ভাগলপুরে আনা হয়। আমার মাতামহ তাঁর ভাগলপুরস্থ 'ওয়াক্‌ফ' সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য ভাগলপুরে ছিলেন, সেখানে আমি ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ছিলাম। আমার মাতামহের মৃত্যুর পর আমি স্থায়ীভাবে কলকাতায় বাস করতে আরম্ভ করি।

১৯২৭ সালে হায়দরাবাদের নিজাম আর একটি পৃথক রাজনৈতিক ভাতা

মঞ্জুর করেন, ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত আমি তা ভোগ করেছিলাম। ভাতা ক্রমাঙ্ক : পি পি ৯২ 'মওহারেখাশ' (Mohwarekhas)।

দিল্লির সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লিতে ১৯২৪ সালে উত্তপ্ত বিতর্ক হয়েছিল, ইংরেজ সরকার যে ভাতা মঞ্জুর করেছিল তা বাড়ানোর জন্য। মূল বিতর্ক আরম্ভ হয়েছিল ওই বছরের নভেম্বর মাসে। মি. কে. বি. এস. এইচ. খান মহাশয়ের তোলা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কৌশলগতভাবে ভাইসরয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য বিলম্ব করছিলেন। শেষ পর্যন্ত স্যার আলেকজাণ্ডার আমার ভাতা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন 'না', যেহেতু ইংরেজরা মনে করত মোগলরা তাদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু সেই কারণেই স্যার আলেকজাণ্ডারের ওই সিদ্ধান্ত ছিল।

সম্মাননীয় যুবরাজ ওয়েলস রেঙ্গুনে ভ্রমণের সময় আমায় একটা 'সোনালি পেয়ালা' দিয়েছিলেন এবং তিনি আমার মাতামহকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আমার জন্যে তিনি প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন তবে একট স্মারকপত্র ভারতের গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয়ের মাধ্যমে তা মহামান্য সম্মাননীয় রাজা পঞ্চম জর্জের কাছে পাঠাতে হবে । সম্মাননীয় যুবরাজ ওয়েলস্ বিদায় নেওয়ার পর একটি আবেদন পত্র জমা করা হয়েছিল রাজা পঞ্চম জর্জের উদ্দেশ্যে পাঠানোর জন্য, কিন্তু ভারতের গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় ওই আবেদন পত্রটি আদৌ পাঠান নি।

আমি বুঝতে পারছিলাম ইংরেজ সরকার আমার দাবি অগ্রাহ্য করবে, সুতরাং চুপচাপ থাকবার সিদ্ধান্ত নিলাম। ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহে আমি অনেক উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসেছিলাম তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি হাকিম আজমল খান, খাজা হাসান নিজামি, তিনি একজন বিখ্যাত উর্দুকবি, অনেক 'রাজা' আমায় বিভিন্নভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। কিন্তু সব সময়ই ভারত সরকারের সিক্রেট সার্ভিসের পক্ষ থেকে আমার উপর গোপনে নজর রাখা হত এবং বিভিন্নভাবে হেনস্থা করা হত, এই অবস্থা চলেছিল ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

কোনও কোনও সময় সিক্রেট সার্ভিসের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ আমার কাছে আসতেন এবং সতর্ক করতেন, আমি যেন সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করি সেই ব্যাপারে নির্দেশ দিতেন। মানসিক চাপ এবং অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে আমি রাজনীতি থেকে দুরেই ছিলাম, না হলে ইংরেজ সরকারের রক্তচক্ষুকে

আমি উপেক্ষা করতাম, সিক্রেট সার্ভিসের আধিকারিকদের লাগাতার কড়া অনুশাসনকে আমি অগ্রাহ্য করতাম।

১৯৪৭ সালের ১৫ অগষ্ট স্বাধীনতার প্রভাত আসতেই মোগলদের উপর সমস্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হয়, ১৯৪৮ সালে কলকাতায় 'প্যালেস্টাইন কনফারেন্স'-এ আমাকে সভাপতিত্ব করার জন্য আহ্বান জানানো হয় এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কাছে আমি দুর্দান্ত জনপ্রিয় হই।'

টীকা:

(১) বাহাদুর শাহ জাফর মারা যান ১৮৬২ সালে ৭ নভেম্বর, তার ২০ বছর বাদে মারা যান জিনাত মহল, সুতরাং ওই তারিখটি হবে ১৭।৭।১৮৮২।

(২) যদিও মির্জা বেদার বখ্‌তের নথিতে বেশ কিছু ভুল তথ্য আছে, বিশেষ করে বাহাদুর শাহ জাফরের মৃত্যু ও জিনাত মহলের মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে। তবুও ১৮৮২ সালে যে জিনাত মহল বেগমের মৃত্যু হয় এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, তখন যদি বেদার বখ্‌তের পিতা মির্জা জামশেদ বখ্‌তের বয়স ৩২ বছর হয় তা হলে তিনি জন্ম নেন ১৮৫০ সালে, যা কার্যত অসম্ভব, কারণ ১৮৫০ সালে মির্জা জওয়ান বখ্‌তের বয়স মাত্র ৯ বছর এবং তখন তার বিবাহই হয়নি। সুতরাং এক্ষেত্রে বেদার বখ্‌ত নিশ্চিতভাবে ভুল তথ্য নথিভুক্ত করেছেন।

(৩) বেগম জিনাত মহল মারা যান ১৮৮২ সালে এবং তার দুবছর বাদে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান পুত্র জওয়ান বখ্‌ত। সুতরাং পুত্রের মৃত্যুশোক ভোগ করতে হয়নি জিনাত মহল বেগমকে।

(৪) রেঙ্গুনস্থ Office of the Commission of Police য়ের পক্ষ থেকে বাজেয়াপ্ত জিনিসের তালিকা করা হয়েছিল, ৮টি বিভিন্ন শ্রেণির ৮৪ রকম জিনিসের উল্লেখ আছে। সেখানে জনৈক Bailiff ওই দ্রব্যের তালিকায় (seizer list) স্বাক্ষর করেন, অনুসন্ধানের তারিখ দেখা যায় ২২।৭।১৯২১ (২৭।৭।১৯২১ নয়)।

২.৮. সংবাদ পত্রের প্রতিবেদন ।

প্রয়াত জামশেদ বখ্‌ত সম্পর্কে The Rangoon Daily News একটি সুদীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশ করে ১৯২১ সালের ১ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার। সেই প্রতিবেদনের বাংলা অনুবাদ নীচে দিচ্ছি, এই প্রতিবেদন থেকে প্রয়াত জামশেদ বখ্‌ত এবং তৎকালীন রেঙ্গুনের ইংরেজ প্রশাসন সম্পর্কে আকর্ষণীয় সংবাদ জানা যাবে।

রেঙ্গুন ডেইলি নিউজ

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ১, ১৯২১ খ্রি.

॥ দিল্লির শাহ্জাদার সমস্যা ॥

প্রয়াত শাহ্জাদা মির্জা মুহম্মদ জামশেদ বখ্তের পরিবারের প্রতি যে চূড়ান্ত অবিচার করা হয়েছে তা আমাদের নজরে এসেছে। যিনি রেঙ্গুনে সাধারণভাবে 'দিল্লির শাহ্জাদা' নামে পরিচিত ছিলেন, গত বছর ২১ ডিসেম্বর তিনি মারা যান।[১] যারা এই শাহ্জাদার ইতিহাস জানেন না তাঁদের অবগতির জন্য জানাই যে তিনি প্রয়াত বাদ্শাহ বাহাদুর শাহ্ জাফরের পৌত্র, তাঁর পিতামহী বেগম জিনাত মহল। হিন্দুস্থানে মহাবিদ্রোহের পর দিল্লির বাদশাহ্ এবং সম্রাজ্ঞীকে তাঁদের পুত্র জবান (জওয়ান) বখ্তসহ নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল বর্মায়। বর্মায় নির্বাসনে থাকার সময়ই পিতা-মাতা ও পুত্র মারা যান, প্রথম দুজনের সমাধি রয়েছে রেঙ্গুনে এবং শেষোক্ত ব্যক্তির সমাধি আছে মৌলমেইনে। অন্যান্য ইতিহাস বিকৃত না করে আমরা বলতে চাই যে শাহ্জাদা জামশেদ এবং তাঁর ভগিনী রৌনক বেগম ইংরেজ-সরকারের কাছ থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাতার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। আমাদের কাছে যে তথ্য এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে বিনা ভাড়ায় একটি ঘরসহ শাহ্জাদা প্রতিমাসে ৪৫০.০০ (চারশত পঞ্চাশ) টাকা হারে ভাতা পেতেন।

শাহ্জাদার তিন পত্নী ছিল, প্রথম পত্নী লাডলি বেগম, দ্বিতীয় হালিমা বিবি এবং তৃতীয় নদরজাহান বেগম। প্রথম এবং তৃতীয় পত্নীকে মুসলিম আইন অনুযায়ী তিনি বিবাহ করেন। প্রথম পত্নী লাডলি বেগম এখনও লখনউতে বাস করছেন, শাহজাদার ঔরসজাত দুই কন্যা রয়েছে তাঁর সঙ্গে, ওই ভাতার একটি অংশ তিনি নিয়মিত পেতেন। [যেহেত জানা গিয়েছে ওই অর্থের পরিমাণ কম বেশি ১০০ টাকা।] হালিমা বিবির গর্ভে একটি পুত্র জন্মায়, মির্জা সিকান্দার বখ্ত, এখন তার বয়স ২০ বছর। ১৯১৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর শাহ্জাদা তৃতীয় বিবাহ করেন [পরিশিষ্ট১ দ্রষ্টব্য], এই মহিলার পিতার আদি নিবাস অযোধ্যা, বলা হয় অযোধ্যা নবাব পরিবারের সাথে তিনি সম্পর্কিত, তাঁর নাম প্যায়ারে মির্জা।

প্যায়ারে মির্জার রেঙ্গুনে একটা ছোটো ব্যবসা। তৃতীয় পত্নীর গর্ভে ১৯২০ সালের ২১ ডিসেম্বর এক পুত্র জন্মায়, মির্জা মুহম্মদ বেয়াদা (বেদার) বখ্ত। এখন তার বয়স মাত্র এক বছর। এই হল দিল্লির শাহ্জাদার জীবনের কাহিনি।

তার নেই বাদশাহি সিংহাসন, রয়েছে সামান্য কিছু টুকিটাকি ঘরের জিনিসপত্র, যা নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনটি ঘোড়াই যথেষ্ট, তার মূল্য অতি নগণ্য, আর আছে একটি ঘড়ি।

শাহজাদার মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নীর পিতা রেঙ্গুনস্থ পুলিশ কমিশনারের কাছে একটি আবেদন পত্র জমা দেন। তাতে অসহায় বিধবা ও তাঁর শিশুপুত্রের কথা বর্ণনা করা হয়, জানানো হয় প্যায়ারে মির্জা ছাড়া তাদের সাহায্য করবার মতো কেউ নেই এবং শাহ্জাদার জীবিতবস্থায় যে অর্থ বরাদ্দ করা হত তা যেন বজায় থাকে। অথবা তাদের বেঁচে থাকবার জন্য যেন অন্য ব্যবস্থা অনুমোদন করা হয়।

পুলিশ কমিশনারের দপ্তর থেকে প্রথম জবাবটি আসতে সময় লেগেছে মাত্র তিন মাস! তাতে জানানো হয়েছে যে বিষয়টি সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে, সেখান থেকে কোনও প্রত্যুত্তর আসেনি। কয়েকদিন বাদে আর একটা জবাব পাওয়া গিয়েছিল মহামান্য পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে, তাতে জানানো হয়েছিল তৃতীয় স্ত্রীর ভাতা অনুমোদন বিষয়ে ভারত সরকারের কাছে সমস্ত তথ্য পাঠানো হয়েছে এবং সেখান থেকে জবাব আসামাত্রই ওই পত্নীর পিতাকে জানিয়ে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বেচারা অসহায় শিশুটিকে রেখে তার বিধবা মাও বিদায় নিয়েছেন এ পৃথিবী থেকে[১]। শাহ্জাদার মৃত্যুর পর তাঁর সমুদয় আসবাব পত্র, অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে কয়েকটি পত্র বিধবা পত্নীটির পিতার কাছে 'নিরাপদ রেখে' যাবতীয় জিনিস নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার কাছে যেগুলো রাখা হয়েছে আমরা অনুসন্ধান করে জেনেছি তা অতি তুচ্ছ জিনিস। কয়েকটি ভাঙা গ্লাস আর চন্দন কাঠের বাক্স নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন, অথচ ভাগ্যের এমনই নিষ্ঠুরতা যে তাঁর বসবার কথা ছিল রাজসিংহাসনে। সে যাই হোক, তাঁর বিধবা পত্নী ও পুত্রের জন্য যে কয়েকটি জিনিস রাখা হয়েছিল কিছুদিন বাদে সেগুলো ও নিয়ে নেওয়া হয়েছে। সত্যি বলতে কী গোটা পরিবার এখন গভীরতর সমস্যায় নিমজ্জিত। এখন এক বছরের অসহায় শিশুর দেখভালের দায়িত্ব পড়েছে শিশুটির মাতামহ মিষ্টার প্যায়ারে মির্জার উপর, সরকার থেকে দেওয়া বাড়িতেই তারা রয়েছেন, কিন্তু সমস্যা সেখানেও, তাদেরকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে তিন দিনের মধ্যে বাড়ি খালি করে দিতে হবে। তিনি বিজ্ঞপ্তি পেয়ে একটি আবেদনে জানিয়েছেন তাঁকে যেন উপযুক্ত সময় দেওয়া হয়, তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে কোনও জায়গায় একটা সুবিধা মতো বাড়ি পেলেই চলে

যাবেন, মনে হচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন তাতে সামান্য কর্ণপাত করেনি।

স্থানীয় প্রশাসনের যেন এরকম উদ্দেশ্য যে কোনও উপায়েই হোক না কেন দুধের শিশুটিকে বাড়ির বাইরে বের করে দিতে হবে, যে শিশুর পিতা ছিলেন একজন শাহ্জাদা। তার ভরণপোষণ কীভাবে হবে, সে প্রশ্ন কিন্তু এখনও ঝুলে রয়েছে। উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রেক্ষিতে আমাদের উদ্দেশ্য এই নয় যে কোনও ব্যক্তি বিশেষ বা সমষ্টিকে দোষ দেওয়া অথবা প্রচলিত আইন ভাঙা হোক সে কথাও বলতে চাই না, আমরা এটাই বলতে চাই যে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া, পরিস্থিতির বাস্তব অবস্থা এবং বিলম্ব, এসবের মূলে রয়েছে 'লাল ফিতের তত্ত্ব', কিন্তু আমরা হৃদয় দিয়ে যা অনুভব করছি, আমরা কেউ কেউ কোনও কিছুর প্রতি কোনও দৃষ্টি দিই না, এক সময় এই পরিবারটি গোটা হিন্দুস্থান শাসন করত, তা হলে তাদের প্রতি একটু সহানুভূতি কি আমরা দেখাতে পারি না? এখনও যদি আরম্ভ করি খুব একটা দেরি হবে না। আমরা এই জিনিসই ভাবব যে মনে হয় সম্মাননীয় মহামান্য স্যার রেগিন্যাল্ট ক্র্যাডক বুঝতে পারছেন না ওই পরিবারটি কী মারাত্মক দুর্দশার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে। আমরা এই বলে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে বিধবার মৃত্যু, তাঁর বাড়ি থেকে সমস্ত আসবাব বের করে নেওয়া, বাড়িতে বসবাস করা থেকে তাকে বঞ্চিত করা প্রভৃতি বিষয়গুলি হয়তো তিনি নাও জানতে পারেন।

সুতরাং আমরা এই আশা করব যে ভারত সরকার কী ব্যবস্থা নেবেন তা তিনি জানেন, অন্তত তার আগে ওই বেচারা শিশুটির মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি কিছু অস্থায়ী ব্যবস্থা নেবেন। এ ব্যাপারে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ দেব আইনজীবী মাননীয় মিষ্টার আর. এস. জেইলকে, তিনি অন্তত এই হতভাগ্য পরিবারটির প্রতি সহানভূতি দেখিয়েছেন এবং মূল্যবান উপদেশসহ সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

টীকা :

(১) মির্জা বেদার বখ্ত তাঁর পিতার মৃত্যুর তারিখ বলেছেন ১৯২১ সালের ২১ জুন, কিন্তু 'রেঙ্গুন ডেইলি নিউজ' লিখেছে ১৯২১ সালের ২১ ডিসেম্বর। বেদার বখ্তের বক্তব্য অনুযায়ী পিতার মৃত্যু ৬ মাস বাদে তাঁর মাও মারা যান, 'রেঙ্গুন ডেইলি নিউজ' সম্ভবত, মায়ের মৃত্যু তারিখ টিকে গুলিয়ে ফেলেছিল।

২.৯ যে জিনিসপত্র রেঙ্গুন পুলিশ দখল (seize) করেছিল তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা পেশ করা হল—

(পৃষ্ঠা ১)

দখল নেওয়ার তারিখ : ২২-৭-১৯২১

এলাকা : Corner of Morton & Commissioner Road

থানা : ল্যানমাডাও (Lanmadaw)

জেলা : রেঙ্গুন

উপস্থিত আধিকারিকের নাম : বেইলিফ (Bailiff)

যে সমস্ত জিনিসের দখল নেওয়া হল তাদের পূর্ণবিবরণ—

ক্রমাঙ্ক		বিবরণ	সংখ্যা
১।	(১)	ভাঙা চিঠির বাক্স	১
	(২)	ভূমি রাজস্বের রসিদ	১০
	(৩)	লেখার খাতা	২
		দাড়ি কামানোর প্যাড	১
		রেজার	১
		কাঁচি	১
	(৪)	অভিধান বই	১
	(৫)	ছবি আঁকবার কাগজের বাক্স	৩
	(৬)	নিবের পাকেট	১
	(৭)	একগাদা কাগজ	১
	(৮)	পুরনো চাবির ছোটো থলে	১
	(৯)	৬ পাই মুদ্রা	১
	(১০)	ছুরি কলম	৩
২।		টিনের বাক্স	১
	(১)	তোয়ালে	৪
	(২)	পুরনো সোয়েটার	১
	(৩)	লম্বা ভেলভেট কুর্তা	১
	(৪)	ছোটো ভেলভেট জ্যাকেট	১
	(৫)	রেশমি জ্যাকেট	১
	(৬)	লম্বা রেশমি জ্যাকেট	১০

(৭)	রেশমি পাজামা	৫
(৮)	পশমের মোজা (জোড়া হিসাবে)	৩
(৯)	পশমের মাফলার	১
(১০)	কলেরা বেল্ট	৩
(১১)	সোনালি রেশমি টুপি	২
(১২)	ছোটো বাক্স	১
	৪০ টাকা ১২ আনা ১ পাই এবং একটা ছুরি কলম	
(১৩)	বই ও কাগজের গোছা	৩
(১৪)	২টি কাগজের বাক্সে রাখা সাবান	৫
(১৫)	২টি কাগজের বাক্সে রাখা সুতোর রিল	২০
(১৬)	ব্যবহৃত নিবের বাক্স	১
(১৭)	সুগন্ধিতরলের বোতল	১
(১৮)	পোশাক পরিষ্কার করবার ব্রাশ	১
(১৯)	কলম ও পেন্সিলের গোছা	১
(২০)	মাংস কাটবার ছুরি	১
(২১)	মোজা	১
(২২)	রেঙ্গুন ঘোড়দৌড়ের প্রতীক	১
৩।	**টিনের বাক্স**	১
(১)	টিনের বাক্সে রাখা সোনালি উষ্ণীষ	১
(২)	কাগজের বাক্সে রাখা বাদামি জুতো (জোড়া)	১
(৩)	তোয়ালে	১০
(৪)	সুতির পাজামা	৮
(৫)	রেশমি পাজামা	১
(৬)	সুতির কুর্তা	১৫
(৭)	সুতির গেঞ্জি	২
(৮)	সুতির মোজা (জোড়া)	৬
(৯)	পশমের তৈরি ওভার কোট	১
(১০)	পশমের পাজামা	১
(১১)	শাল	১

(১২) ছোটো ফলকাটা ছুরি ১
(১৩) পেন্সিল ও কলমের বাক্স ১
(১৪) ২টি কাগজের বাক্সে রাখা সাবান ৪
(১৫) ২ টাকা ১০ আনাসহ ছোটো টাকার থলে ১

(পৃষ্ঠা ২)

৪। **কাঠের বাক্স** ১
(১) কাগজ ও চাবি রাখার জন্য টিনের চোঙা ১
(২) তোয়ালে ৫
(৩) গেঞ্জি ৫
(৪) রুমাল ১২
(৫) ছোটো সোনালি ফিতের টুকরো ১
(৬) পুরনো রুমালের গোছা ১
(৭) কাগজের ছোটো গোছা ১
(৮) ছাপা বই ৬১
(৯) পুস্তকের পাণ্ডুলিপি ৩
(১০) কাচের রেকাবসহ কাঠের কলমদানিসহ কলম ও পেন্সিল ১
(১১) নগদ ১ টাকা ১
(১২) আনোয়ার (Anwar) রাজ্যের ১ টাকার ১টি মুদ্রা, ১টি রুপোর জাপানি ছোটো মুদ্রা এবং ১টি তামার মুদ্রা
(১৩) কাঠের তৈরি কালি শুষে নেওয়া প্যাড ১
(১৪) কালির দোয়াতসহ কাঠের পুরনো কলমদানি ১

৫। **ডিল (Deal) কাঠের বাক্স** ১
(১) চায়ের প্লেট (বিভিন্ন রকম) ৬৭
(২) চায়ের পেয়ালা ৩২
(৩) চা ভেজানোর পাত্র ১
(৪) বড়ো দুধের জগ ৫
(৫) ছোটো দুধের জগ ৩
(৬) ছোটো চায়ের পেয়ালা ১৬
(৭) ছোটো চায়ের প্লেট ৮

(৮) চিনা মাটির পেয়ালা ৯
(৯) ছোটো পাত্র (বাটি) ১
(১০) ফুল রাখার ছোটো বোতল ২
(১১) এনামেল করা ছোটো পেয়ালা ১

৬। **একটি ডিল কাঠের বাক্স**

(১) চায়ের প্লেট ৪০
(২) চায়ের পেয়ালা ৩০
(৩) চায়ের পাত্র ৩
(৪) দুধের জগ ৩
(৫) ছোটো চায়ের পেয়ালা ১৩
(৬) ছোটো চায়ের প্লেট ১৩
(৭) ছোটো চা ভেজানোর পাত্র ১
(৮) ছোটো দুধের জগ ৪
(৯) ছোটো চিনি রাখার পেয়ালা ১
(১০) চিনা মাটির পেয়ালা ১

৭। **একটি ডিল কাঠের বাক্স**

(১) অন্যান্য সামগ্রীসহ ঘোড়ার জিন ১

৮। **একটি আলমারি**

(১)

(পৃষ্ঠা৩)

নিরাপদে রাখবার জন্য প্রয়াত প্রাক্তন দিল্লির শাহ্জাদা জামশেদ বখ্তের বাড়ির আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী তাঁর শ্বশুর মিষ্টার প্যায়ারা মির্জার কাছ থেকে নেওয়া হল।

ক্রমাঙ্ক ৮ থেকে ১১	আলমারি	৪
,, ১৩	টেবিল	২
,, ১৫	গদিসহ দু বিছানার খাট	১
,, ১৬	ডিম্বাকৃতি খাওয়ার টেবিল	১
,, ১৯	এক বিছানার খাট	১
,, ২৪	কাঠের আসন	১
,, ২৫	দুজনের খাট	১

,,	২৬	পুরাতন টেবিল	১
,,	২৭	ফুলদানি	১
,,	২৯	ঝুলন্ত বাতি	১
,,	৩০	হাতলবিহীন চেয়ার	২
,,	৩১	,,	২
,,	৩২	বড় আরাম কেদারা	১
,,	৩৪	ভাঙা আলমারি	১
,,	৩৬	খাবার রাখার আলমারি	১
,,	৪০	তেপায়া	১

রেঙ্গুন
তারিখ : নভেম্বর, ১৯২১

(স্বাক্ষর)
বেইলিফ
পুলিশ কমিশনারের দপ্তর
রেঙ্গুন

টীকা : (১) সম্ভবত দুবারে জিনিসপত্রের দখল নেওয়া হয়, ২২/০৭/১৯২১ এবং নভেম্বর, ১৯২১ এই দুই তারিখে।

শাহজাদা মির্জা বদার বখ্‌ত মাত্র এক বছরে বয়সে পিতামাতাকে হারিয়ে অনাথ হলেন। এদিকে তাঁর পিসি রৌনক বেগম সম্পর্কে নির্দিষ্ট সংবাদ মেলে না, তিনি কি বিবাহ করেছিলেন, অথবা কীভাবে তাঁর দিন চলত সে বিষয়ে কোনও তথ্যই নেই। রেঙ্গুন ডেইলি নিউজের প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট দীর্ঘ সময় তিনি দাদা জামশেদ বখ্‌তের সাথে ছিলেন তারপর হয়তো অন্যান্য শাহ্‌জাদিদের মাতা তিনিও হারিয়ে গিয়েছেন।

২.১০. শাহজাদা মির্জা জামশেদ বখ্‌তের বংশ বৃক্ষ

মির্জা জওয়ান বখ্‌ত—নবাব শাহ জমানি বেগম

মির্জা জামশেদ বখ্‌ত

ক.লাডলি বেগম (লখনউ)	খ.হালিমা বিবি	গ. নদর জহান বেগম
১.কন্যা	↓	↓
২.কন্যা	মির্জা সিমান্দা বখ্‌ত	মির্জা বেদার বখ্‌ত
		জন্ম : ২২ ডিসেম্বর, ১৯২০
		মৃত্যু : ২২ মে, ১৯৮০

মির্জা জামশেদ কলেজে পড়েছিলেন। তিনি প্রথম বিবাহ করেন ১৯০৫ সালে। তৃতীয় বিবাহ করেন ১৯৩৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিবাহটি সম্ভবত, মুসলিম আইন অনুযায়ী হয়নি। ওই পত্নী ছিলেন স্থানীয় বর্মার মুসলিম পরিবারের মেয়ে, হালিমা বিবি। তার গর্ভে জন্মায় সিকান্দার বখ্‌ত। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু রেঙ্গুণ পরিভ্রমণের সময় তাঁকে বাহাদুর শাহ জাফরের সমাধি সৌধ রক্ষাবেক্ষণের জন্য নিয়োগ করেন।

২.১১. শাহ্‌জাদা মির্জা বেদার বখ্‌ত।

মির্জা বেদার বখ্‌তের মা নদর জঁহা (জহান) বেগম, তাঁরা ছিলেন শিয়া, অন্যদিকে মোগল বংশধর জামশেদ বখ্‌ত সুন্নি। মির্জা বেদার বখ্‌তের জন্ম তারিখ ২২ ডিসেম্বর, ১৯২০, জন্মস্থান রেঙ্গুন। ১৯২১ সালের ২১ জুন মারা যান পিতা জামশেদ বখ্‌ত, কিন্তু বেদার বখ্‌তের বয়স তখন মাত্র ৬ মাস, পিতা মারা যাওয়ার পরে ইংরেজ প্রশাসন ঘর খালি করবার নির্দেশ দেয়, সমস্ত জিনিপত্রের দখল নেয়। সে সব কাটতে না কাটতেই মৃত্যু হয় মা নদর জাঁহা বেগমের, তখন বেদার বখ্‌ত মাত্র এক বছরের শিশু।

ইংরেজ প্রশাসন কিন্তু বেদার বখ্‌ত তথা প্রয়াত জামশেদ বখ্‌তের পরিবারের সঙ্গে যে আচরণ করেছিল রেঙ্গুন ডেইলি নিউজের প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট যে রেঙ্গুনের লোকজন বিষয়টি জানতেন এং তাঁরা অসন্তুষ্ট ছিলেন। মাতামহ প্যায়ারে মির্জা (বা মিঞাঁ)র নাছোড়বান্দা মানসিকতা এবং সহৃদয় আইনজীবী মিষ্টার আর. এস. জেইলের (Mr. R. S. Jail) আন্তরিকতা ও চেষ্টা ইংরেজ সরকার বাধ্য হয় শিশু বেদার বখ্‌তের জন্য রাজনৈতিক ভাতা অনুমোদন করতে। বেদার বখ্‌তের লেখা তথ্যানুযায়ী ওই ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ১৯২২ সালের ৫ জানুয়ারি। লক্ষণীয় ইংরেজ সরকারের গড়িমসিভাব, ইচ্ছাকৃত বিলম্ব, জামশেদ বখ্‌তের সমুদয় সম্পত্তির দখল নেওয়া, বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার সতর্কবার্তা ইত্যাদির বিরুদ্ধে 'রেঙ্গুন ডেইলি নিউজ' তীব্রভাষায় সমালোচনা করে। ওই সংবাদ প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালের ১ ডিসেম্বর এবং তার কিছুদিন বাদেই ইংরেজ প্রশাসন নড়ে চড়ে বসে এবং ৫।১।১৯২২ তারিখে শিশু বেদার বখ্‌তের ভাতা দেওয়ার আদেশ জারি করে। ঠিক কী পরিমাণ ভাতা শিশু বেদার বখ্‌তকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা বেদার বখ্‌ত জানান নি। তাঁর বংশের ইতিহাস বা কাহিনি বেদার বখ্‌ত লিপিবদ্ধ করেছেন অনেক পরে, স্বাভাবিক ভাবেই কোনও

কথা তাঁর মনে ছিল না, হয়তো লিখিত তথ্যও হারিয়ে গিয়েছিল। তিনি নির্ভর করেছিলেন অন্যের উপর। যাইহোক, এইরকম এক সংকটাপূর্ণ পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড়ো সমস্যায় পড়লেন শিশুর মাতামহ মির্জা প্যায়ারে। তিনি যে খুব বড় আর্থিক সম্পদের অধিকারী ছিলেন তা নয়, সবচেয়ে বড় কথা বেদার বখ্‌ত তখন দুগ্ধপোষ্য শিশু। সম্ভবত, মোগল বংশধরের এই সংকটাপূর্ণ অবস্থার কথা হিন্দুস্থানেও পৌঁছেছিল, ১৯২৪ সালে দিল্লির লেজিসলেটিভ আসেমব্লিতে শিশু বেদার বখ্‌তের ভাতা বৃদ্ধি কেন হবে না তা নিয়ে বিতর্কই তা প্রমাণ করে। যদিও শেষ পর্যন্ত লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বিল ভাতা বৃদ্ধিতে অনুমোদন দেয়নি। দীর্ঘ বিতর্কের পর স্যার আলেকজাণ্ডার স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যেহেতু ইংরেজ সরকার মনে করে হিন্দুস্থানে ইংরেজদের অন্যতম প্রধান শত্রু মোগলরা, তাই কোনও মোগল বংশধরের ভাতা বৃদ্ধির ব্যাপারে নূন্যতম আগ্রহ বা ইচ্ছা নেই। যখন ইংরেজ প্রশাসন (৫।১।১৯২২) বেদার বখ্‌তের রাজনৈতিক ভাতা মঞ্জুর করে, তখন তিনি রেঙ্গুনেই ছিলেন। পিতামহ প্যায়ারে মির্জাও সামান্য হলেও স্বস্তি পেয়েছিলেন, সেই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে তদানীন্তন আজমল খান হিন্দুস্থানে চলে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। শিশু বেদার বখ্‌তকে নিয়ে হিন্দুস্থানে চলে আসেন প্যায়ারে মির্জা। ঠিক কোন্ সময় তিনি বেদার বখ্‌তকে নিয়ে হিন্দুস্তানে এসেছিলেন সে বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য নেই। কোন্ পথে এসেছিলেন তা জানা যায় বেদার বখ্‌ত প্রদত্ত তথ্য থেকে তিনি জানিয়েছিলেন কলকাতা হয়ে তাঁর পিতামহ তাঁকে নিয়ে দিল্লি গিয়েছিলেন। সম্ভবত, জাহাজেই রেঙ্গুনে থেকে প্যায়ারে মির্জা কলকাতায় পৌঁছেছিলেন।

হিন্দুস্থান থেকে শেষ মোগল বাদশাহ্ বাহাদুর শাহজাফর বিদায় নিয়েছিলেন ১৮৫৮ সালে, ডায়মণ্ড হারবার থেকে তাঁর জাহাজ ছেড়েছিল ডিসেম্বর। এরপর তিনি আর হিন্দুস্থানে আসার সুযোগ পান নি, রেঙ্গুনেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর দুই পুত্র মির্জা জওয়ান বখ্‌ত এবং মির্জা শাহ্ আব্বাস আবেদন জানিয়েছিলেন রেঙ্গুন থেকে তাঁদের ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হোক, সে আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বেগম জিনাত মহল হিন্দুস্থানে ফেরার আরজি জানিয়েছিলেন, সে আরজিও পত্রপাঠ খারিজ করা হয়। প্রয়াত বাদশাহ্ বাহাদুর শাহ্ জাফরের প্র-পৌত্র শিশু মির্জা বেদার বখ্‌ত তাঁর পূর্ব পুরুষের প্রিয় হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্তন করলেন প্রায় পৌণে একশত বছর পরে। আর কখনও তিনি রেঙ্গুনে যান নি।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

৩.১. হিন্দুস্থানে শাহ্‌জাদা মির্জা বেদার বখ্‌ত।

পরবর্তীকালে বেদার বখ্‌তের লেখা তথ্য থেকে জানা যায় কলকাতা হয়ে তাঁকে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তিনি দিল্লিতে কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি জনাব আজমল খানের বাড়িতেই ছিলেন।

বেদার বখ্‌তের স্মৃতিকথায় এক জায়গায় আছে, 'বেশ কিছুদিন হাকিম আজমল খানের গৃহে থাকার পর ১৯২৬ সালে আমাকে ভাগলপুরে আনা হয়'। ধরে নেওয়া যায় ১৯২৬ সালে ভাগলপুরে আসবার আগে পর্যন্ত তিনি হাকিম আজমল খানের বাড়িতে ছিলেন। দিল্লিতে তিনি কখন গিয়েছিলেন সে তথ্যও স্পষ্ট নয়। তবে ১৯২৪ সালে দিল্লিতে লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লিতে যখন তাঁর ভাতা বৃদ্ধি বিষয়ে বিতর্ক চলছিল তিনি হিন্দুস্থানে ছিলেন এবং মনে হয় তার আগে থেকেই তিনি হাকিম আজমাল খানের গৃহে পৌঁছেছিলেন।

৩.২. ভাগলপুর এবং কলকাতায় শাহ্‌জাদা মির্জা বেদার বখ্‌ত।

দিল্লি থেকে ১৯২৬ সালে তাঁর মাতামহ তাঁকে নিয়ে আসেন বিহারের ভাগলপুরে। প্যায়ারে মির্জার সেখানে কিছু 'ওয়াক্‌ফ' সম্পত্তি ছিল, সেসব তত্ত্বাবধান করবার জন্য তিনি দৌহিত্রকে নিয়ে ভাগলপুরে উপস্থিত হন। এই সময় শিশু বেদার বখ্‌তের বয়স ছিল ৬ (ছয়) বছর। যে সময় (৫।১।১৯২২) ইংরেজ সরকার শিশু বেদার বখ্‌তের জন্য ভাতা মঞ্জুর করে, প্রায় একই সময়ে হায়দরাবাদের নিজাম সরকারও শিশু বেদার বখ্‌তের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে। যেভাবেই হোক বেদার বখ্‌তের দুর্দশার সংবাদ পৌঁছেছিল তাঁদের কাছে এবং তাঁরা নির্বাক, নিশ্চল হয়ে থাকতে পারেন নি। একদিন হায়দরাবাদ ছিল মোগলদের অধীনস্ত ছোট্টরাজ্য, সেই মোগল বংশধর আর্থিক অনটনের মধ্যে অসহায় বোধ করেছেন জেনেই তাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

বেদার বখ্‌তের স্মৃতিকথা অনুযায়ী ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তিনি ভাগলপুরে ছিলেন, তরপর কলকাতায় চলে আসেন। ১৯৩২ সালে বেদার বখ্‌তকে নিয়ে

মাতামহ প্যায়ারে মির্জা কলকাতার মেটিয়া বুরুজে ছিলেন, এর প্রমাণ রয়েছে। ১৪।১০।১৯৩২ তারিখে প্যায়ারে মির্জা হায়দরাবাদের নিজাম সরকারকে একটা অনুরোধ পত্র পাঠান সেই চিঠির সূত্র ধরে স্মারক ক্রমাঙ্ক ৭২১এ, তারিখ ১১ জুলাই, ১৯৩৩ দ্বারা নিজাম সরকারের অর্থ বিভাগ থেকে 'মিষ্টার প্যায়ারে মির্জা, ইমামবাড়া, মেটিয়াবুরুজ, কলিকাতা' ঠিকানায় একটি চিঠি পাঠানো হয়। অর্থাৎ ১৯৩৩ সালে বেদার বখ্‌তকে নিয়ে তিনি ওই ঠিকানায় থাকতেন।

ওই চিঠিটি নিজাম সরকারের পক্ষ থেকে পাঠিয়েছিলেন আইনজীবী তথা নিজাম সরকারের অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল মির্জা নসরুল্লাহখান [পরিশিষ্ট২ দ্রষ্টব্য]। এই চিঠি থেকে স্পষ্ট ২৬।৫।১৯২৬ তারিখের ব্যাঙ্কের স্থায়ী আদেশ ক্রমাঙ্ক ২৭ অনুসারে বেদার বখতকে ৫০.০০ (পঞ্চাশ টাকা) হারে মাসিক ভাতা মঞ্জুর হয়। (এই সময় ১০ গ্রাম সোনা = ২৪.০৫ টাকা) । ১১।৭।১৯৩৩ তারিখের চিঠি থেকে জানা যায় এই সময় প্যায়ারে মির্জা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ ছিলেন, তাঁর পক্ষে দস্তখত করা সম্ভব ছিল না এবং হায়দরাবাদের ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিকে ওই চিঠিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্বাক্ষরের পরিবর্তে যেন টিপ ছাপ নিয়ে ওই অর্থ দেওয়া হয়। এই সময় বেদার বখ্‌তের বয়স ছিল ১৩ বছর। এখন সে কিশোর বেদার বখ্‌ত।

কলকাতার মেটিয়াবুরুজের ইমামবাড়ায় দৌহিত্র ও মাতামহ কতদিন ছিলেন বলা কষ্টকর। তবে ১৩।৮।১৯৪২, পত্র ক্রমাঙ্ক আর. সি. এস. (R.C.S) ২২/৩০৭৯ অনুযায়ী জানা যাচ্ছে বেদার বখ্‌ত ওই সময় আবার ভাগপুরে চলে গিয়েছিলেন। ওই সময় তিনি থাকতেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় : 'মহলা মাহজিদপুর খুর্দ, ভাগলপুর, বিহার'। চিঠিটি লেখা হয়েছিল হায়দরাবাদস্থিত ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধির পক্ষ থেকে [পরিশিষ্ট৩ দ্রষ্টব্য]। ডাকঘরের 'মানি অর্ডার' মারফত তাঁর প্রাপ্যভাতা দেওয়া হত তা জানা যাচ্ছে এবং তাঁকে বলা হচ্ছে নিয়মিতভাবে আগের মতো তাঁর 'জীবিতশংসাপত্র' (Life certificate) জমা দিতে হবে।

ভাগলপুরে প্যায়ারে মির্জা মারা যান। তবে সঠিক তারিখ নথিভুক্ত নেই কোথাও। তিনি যে ভাগলপুরে মারা যান এ তথ্য জানিয়েছেন বেদার বখ্‌তের পত্নী সুলতানা বেগম, তিনি নির্দিষ্ট তারিখ জানাতে পারেন নি। তাঁর কথা অনুযায়ী মির্জা বেদার বখ্‌তের বয়স যখন ১৮ বছর, প্রিয় মাতামহ প্যায়ারে মির্জা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শাহ্‌জাদা মির্জা বেদার বখ্‌তের কাছে মাতামহই ছিল

তাঁর গোটা পৃথিবী, পিতা, মাতা, পিতামহ, মাতামহ প্রত্যেকের ভূমিকা পালন করেছেন ওই বৃদ্ধ, বাঁচিয়ে রেখেছিলেন মোগল বংশধরকে। বিভিন্ন জায়গায় ছুটে বেড়িয়েছেন, রেঙ্গুন, দিল্লি, হায়দরাবাদের নিজাম সরকার, ইংল্যান্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ, কোথায় চিঠি লেখেন নি তিনি তাই যেন ১৮ বছরে দৌহিত্র সাবালক হওয়ার পর, যেন সাবালক তৈরি করেই তিনি বিদায় নিলেন। পূর্বোক্ত তথ্য সঠিক হলে প্যায়ারে মির্জার ১৯৩৮ সালে মৃত্যু হয়।

কোনও কারণে নিজাম সরকার প্রদত্ত ভাতা 'মাহ্য়ার' (Mahwar) বন্ধ ছিল। ১৯৪৮ সালে ২১ ডিসেম্বর ২২১ ক্রমাঙ্ক সম্বলিত এক চিঠিতে নিজাম সরকারের অর্থবিভাগের সচিব জানিয়েছেন 'মিষ্টার মির্জা মুহম্মদ বেদার বখ্ত' তাঁর প্রাপ্য 'মাহ্য়ার' আগের মতোই গ্রহণ করতে থাকবেন [পরিশিষ্ট ৪ দ্রষ্টব্য]। এই সময় শাহ্জাদা মির্জা বেদার বখ্ত থাকতেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় : ১৫ আলিম উদ্দিন স্ট্রিট, ডাকঘর পার্ক স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০১৬।'

এরপর তিনি আবার ফিরে যান ভাগপুরে এবং সম্ভবত, হায়দরাবাদের ইম্পোরিয়াল ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিকে যাওয়ার আগে তিনি তাঁর ঠিকানা পরিবর্তন বিষয়ে অবহিত করেছিলেন এছাড়া তিনি যে হঠাৎই ভাগপুরে গিয়েছিলেন তা নয়, বিশেষ কোনও দীর্ঘস্থায়ী ভাবনা ছিল। ১০।২।১৯৪৯ তারিখে তিনি চিঠি লেখেন, ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি ১৬।২।১৯৪৯ তারিখে চিঠির জবাব পাঠান, ওই চিঠিতে দেখা যাচ্ছে ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি তাঁদের কলিকাতার অফিসকে জানাচ্ছেন কলিকাতার অফিস যেন ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্কের ভাগলপুর শাখাকে বেদার বখ্তের প্রাপ্য ভাতা সেখান থেকে (ভাগলপুর থেকে) দিয়ে দেয় [পরিশিষ্ট ৫ দ্রষ্টব্য]। ওই চিঠি থেকে জানা যায় জনৈক মাহ্বুব বখ্শ মোখতারের বাড়িতে মির্জা বেদার বখ্ত থাকতেন। ঠিকানা ছিল নিম্নরূপ :

'বরাহপুরা, ভাগলপুর, বেহার।'

এই চিঠিতে বেদার বখ্তকে 'শাহ্জাদা মির্জা মুহম্মদ বেইদার বখ্ত' নামে সম্বোধন করা হয়েছে। যে সমস্ত নথি হাতে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তিনি ভাগলপুরেই ছিলেন। ওই সময় তিনি কী করতেন তা স্পষ্ট নয়। তাছাড়া একটি নির্দিষ্ট স্থায়ী ঠিকানাও তাঁর ছিল না। প্রাপ্ত নথি বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত ঠিকানাগুলি পাওয়া যায়—

(১) প্রযত্নে মৌলভি মাবুদ বক্স, মোখতার,
বরাহপুরা, ভাগলপুর, বিহার।

(২) মৌলনাচক, ভাগলপুর, বিহার।

(৩) প্রযত্নে আসতিক হুসেইন, মোহিউদ্দিনপুর মহল্লা,

ডাকঘর—হাবিবপুর, জেলা ভাগলপুর, বিহার।

ভাগলপুরে থাকাকালীন ৩০।৩।১৯৫০ তারিখে তিনি হায়দরাবাদের নিজাম সরকারের কাছে অনুরোধ করেন তাঁর ভাতা যেন বৃদ্ধি করা হয়। স্মারক ক্রমাঙ্ক ৪৫৩, তারিখ ৮।২।১৯৫০, স্মারক ক্রমাঙ্ক ৫৫৬, তারিখ ১৪।৩।১৯৫০ এবং স্মারক ক্রমাঙ্ক ৬৫৩, তারিখ ১২।৪।১৯৫০ তিনটি চিঠিতে নিজাম সরকার জানায় তাঁর অনুরোধ সরকারের প্রচলিত আদেশ অনুসারে রাখা সম্ভব নয় [পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য]। নিজাম সরকারের অর্থবিভাগের সচিবের পক্ষে ওই চিঠি পাঠানো হয়[১]।

ভাগলপুরের মৌলনাচকের ঠিকানায় মির্জা বেদার বখ্‌তকে ভাগলপুরের ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি ১৭।১২।১৯৫২ তারিখের এক চিঠিতে জানায় হায়দরাবাদ সরকার তাঁকে যে ৫০ টাকা (পঞ্চাশ) হারে ভাতা দিত হায়দরাবাদের স্টেট ব্যাঙ্কের হায়দরাবাদের শাখার নির্দেশানুসারে ওই ভাতা দেওয়া বন্ধ করা হল।[১] পাশাপাশি তাঁকে পরামর্শ দেওয়া হয় তিনি যেন ভারত সরকারের অধীনস্ত হায়দরাবাদ রাজ্যের মহা-গাণনিকের দপ্তরে পেনশান বিভাগে আবেদন করেন এবং তাঁর প্রাপ্ত প্রতি মাসে ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে ভাতার পূর্ণ বিবরণ পেশ করেন [পরিশিষ্ট ৭ দ্রষ্টব্য]।

সময় নষ্ট না করে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আবেদনপত্র পূর্বোক্ত ঠিকানায় পাঠান ৫।৩।১৯৫৩ তারিখে। ওই চিঠির জবাব আসে ভারত সরকারের হায়দরাবাদ রাজ্যের মহা-গাননিকের কাছ থেকে। ওই চিঠিতে হায়দরাবাদের মহা-গাননিক বিহার রাজ্যের মহা-গাননিকের কাছে অনুরোধ করেন, 'শ্রী মুহম্মদ বেইদার (বেদার) বখ্‌তকে ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা মাসিক যে ভাতা দেওয়া হত সেই সম্পর্কিত পূর্ণ বিবরণ কতবার দেওয়া হয়েছে এবং তার তারিখ যেন ভাগলপুর কোষাগার থেকে নিয়ে তাঁদের জানানো হয়। অবগতির জন্য ১৩৭৭ ক্রমাঙ্কের ২৮।৩।১৯৫৩ তারিখের চিঠির অনুলিপি পাঠানো হয় বেদার বখ্‌ত কে [পরিশিষ্ট ৮ দ্রষ্টব্য]। চিঠিতে স্বাক্ষর করেন সহকারী হিসাব রক্ষক। ২২।১২।১৯৫৪ তারিখে হায়দরাবাদ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অর্থদপ্তরের সহকারী সচিব সি. আর শেষাদ্রি এক চিঠিতে মির্জা বেদার বখ্‌ত কে জানান, ১৯৫৪ সালের হায়দরাবাদের 'আর্থিক অনুদান বিলোপ (সংশোধন) আইন'টি ওই রাজ্যের

অর্থবিভাগের স্মারক ক্রমাঙ্ক ২৬৩২, তারিখ ১৮।৮।১৯৫৪ অনুসারে কার্যকর করা আরম্ভ হয়েছে এবং ওই আইন এবং অর্থদপ্তরের নির্দেশানুসারে তাঁর প্রাপ্য ভাতা ১।৮।১৯৫৮ তারিখ থেকে বন্ধ করা হয়েছে। ১।৪।১৯৫৪ তারিখে যে সব প্রাপকের বয়স ৬০ (ষাট) বছর বা তার বেশি, তারাই একমাত্র ওই ভাতা পেতে থাকবেন। যদি তিনি উপরোক্ত শর্ত পূরণ করতে পারেন তবে যেন ওই অনুদান প্রাপ্তি পুনর্নবিকরণের জন্য হায়দরাবাদ রাজ্যের মহা-নাগরিকের দপ্তরে এক 'সিভিল সার্জন' প্রদত্ত শংসা পত্রসহ আবেদন করেন।

সুতরাং ওই সময় থেকে হায়দরাবাদ সরকারের কাছ থেকে ভাতা পাওয়া বন্ধ হল, তখন বেদার বখ্‌তের বয়স ছিল ৩৪ বছর। [পরিশিষ্ট ৯ দ্রষ্টব্য]। বোধ হয় এর পরেই তিনি স্থায়ীভাবে কলকাতায় থাকতে আরম্ভ করেন।

টীকা : (১) ১৩-১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ ভারত সরকার সামরিক শক্তির মাধ্যমে হায়দরাবাদ রাজ্য অধিকার করে। তারপরই এই ঘটনা ঘটে।

৩.৩ কলকাতায় স্থায়ীভাবে মির্জা বেদার বখ্‌ত।

ভাগলপুরের পাট চুকিয়ে তিনি কবে কলকাতায় স্থায়ীভাবে থাকতে আরম্ভ করেন তা সঠিক জানা যায় না। ডা. বিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন একটি সংবাদপত্রে মির্জাবেদার বখ্‌ত সম্পর্কে একটা ছোট্ট প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। ১৯৬২ সালের ১৫ মে তিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর দুর্দশার কথা জানান। ওই সময় তিনি এন্টালি এলাকায় ২৩ নং ক্যান্টোফার লেনের এক ভাড়া ঘরে বাস করতেন। একটি প্রতিষ্ঠিত ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্রে (সম্ভবত, হিন্দুস্তান টাইমস্) নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছিল :

Last Moghul Descendant In Distress : By a Staff Reporter, Mirza Md. Bedar Bukht Bahadur, a great grandson of the last Moghul Emperor of Delhi, Bahadur Shah II, has in a letter drawn Mr. Nehru's attention to the distressing condition he has been living in for the last few years.

Mr. Bahadur, who is now staying at 23 Cantopher Lane, Calcutta, met the State Chief Minister, Dr. Roy, on May 15 last. Dr. Roy is reported to have assured him that he would recommend his case to the Centre.

In his letter, Mr. Bahadur has requested the Government of India to grant him a monthly allowance of Rs. 500.

'If nothing is done, I would not go on crying in vain but would take my seat near the tomb of Humayun as a street beggar to let the world laugh at the straits which the last descendant of the great Moghul Emperor of Delhi has been brought too,' the letter said to the effect.

Meanwhile the Government of India is considering the case of Mr. Bahadur, it is learnt.

তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধান চন্দ্র রায় বলেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তিনি বেদার বখ্‌তের হয়ে সুপারিশ করবেন। বাহাদুর শাহ জাফরের বংশধর অনুরোধ করেছিলেন তাঁকে যেন মাসিক ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকার ভাতা মঞ্জুর করা হয়। (১৯৬২ সালে দশ গ্রাম সোনার মূল্য ১১৯.৭৫ টাকা)।

ওই আবেদন পত্রে তিনি জানান, 'যদি কিছুই না হয়, আমি এভাবে কেঁদে কেঁদে বিফল হবো না, পথের ভিক্ষুকের মতো বসব দিল্লির হুমায়ুনের স্মৃতিসৌধের কাছে, শেষ মোগল বাদশাহের বংশধর কীভাবে আছে লোকে জানুক।'

এর কিছুদিন বাদে একাধিক সংবাদপত্রে ওই প্রতিবেদন প্রকাশ করে। The Statesman লেখে—

The Govt. of India has sanctioned a monthly pension of Rs. 250.00 (Two hundred fifty) in favour of Prince Mirza Md. Bedar Bukht, the great grandson of the last Moghul Emperor, Bahadur Shah II.

Another sum of Rs. 500.00 (Five hundred) was also sanctioned by the Prime Minister as an immediate relief to the Prince, who has been living in acute distress in a house of 24, Cantopher Lane, Entally for some time past.

বুঝতে অসুবিধা হয় না ডা. বিধান চন্দ্র রায়ের জোরালো সুপারিশ এক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকর ভূমিকা নিয়েছিল। ওই একই বিষয়ে 'হিন্দুস্থান টাইমস্' লেখে—

PENSION FOR BAHADUR SHAH'S DESCENDANT

By a Staff Reporter : The Union Government has sanctioned a monthly pension of Rs. 250, tenable for life, to Mirza Mohammed Bedar Bukht Badhadur. who claims to be a great-grenadon of the last Moghul Emperor of India. H.I.M. Bahadur

Shah Zafar by the West Bengal Government's Home Department.

The Centre's decision will take effect from August 23. The Prime Minister is stated to have granted him Rs. 500 for immediate relief.

একটি বহুল প্রচলিত বাংলা দৈনিক লেখে (আনন্দ বাজার পত্রিকা) :

'শাহজাদা মির্জা মুহম্মদ
বাহাদুর শাহের প্রপৌত্রকে সাহায্য দান
(স্টাফ রিপোর্টার ৭-৯-১৯৬২)

ভারতের শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের প্র-পৌত্র শাহ্জাদা মির্জা মুহম্মদ বেদার বখ্ত্ বাহাদুরকে ভারত সরকার আজীবন মাসিক আড়াইশত টাকা করিয়া সাহায্য দিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সংবাদে প্রকাশ, ইহা ছাড়া প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাহার জন্য এককালীন আরও পাঁচশত টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

গৌরবময় মোগল সাম্রাজ্যের শেষ বংশধর শাহ্জাদা বেদার বখ্ত কলকাতার ক্যান্টোফার লেনের এক চিলতে ঘরে আছেন। কিছুকাল পূর্বে আনন্দবাজার পত্রিকায় শাহ্জাদা সম্পর্কে একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়।'

একই সংবাদ প্রকাশ পায় অমৃতবাজার পত্রিকায়। তবে এসব পত্রিকা যে শুধুমাত্র সংবাদ প্রকাশ করেই শান্ত ছিল তা নয় এবং বেদার বখ্তের ওইভাতা অনুমোদন নিয়ে প্রতিবাদও করেছিল কেউ কেউ, ওই একই তারিখে 'বসুমতি' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদই তা প্রমাণ করে :

বসুমতি নানাকথা : 'মির্জ্জা মুহম্মদ বেদার বক্ত কলিকাতায় বাস করেন। তিনি হলেন দিল্লীর শেষ মুসলমান সম্রাটের প্রপৌত্র। গত ১৫ই মে তিনি পশ্চিমবঙ্গে প্রধান সচিবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, গত কয় বৎসর হইতে তিনি অত্যন্ত দুরাবস্থায় কালযাপন করিতেছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী জওহরলালকে পত্র লিখিয়াছেন, যদি তাঁহাকে মাসিক পঁচ শত টাকা ব্যক্তি দেওয়া না হয় তবে তিনি দিল্লিতে যাইয়া হুমায়ুনের সমাধির সম্মুখে রাজপথে বসিয়া ভিক্ষা করিবেন—লোক দেখুক মোগল বাদশাহের বংশধরের কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব নাকি তাঁহার জন্য কেন্দ্রীয়সরকারের কাছে সুপারিশ করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। বৃত্তি পাঁচ শতই হোউক বা পাঁচ টাকাই হউক দেশের লোকের অর্থ হইতেই তাহা দিতে হইবে। কিন্তু কোনও আধিকারে মির্জ্জা মহম্মদ বেদার

বক্ত মাসোহারা পাইতে পারেন এবং কি কারণেই বা ভারত সরকার তাহা দিতে পারেন? তবে কথা আছে রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিতে থাক দ্বারমুক্ত হইবে; চাহিতে থাক পাইবে।'

বসুমতি পত্রিকা প্রশ্ন তুলেছিল কেন টাকা দেওয়া হবে? মির্জা মুহম্মদ বেদার বক্ত কোন্ আধিকারে মাসোহারা পাবেন এবং কেনই বা ভারত সরকার তা অনুমোদন করবে? এই প্রতিবেদন যখন ছাপা হয়েছিল তখন ওই ভাতা অনুমোদিত হয়নি কিন্তু অল্প হলেও জনমতের একাংশ ওই ভাতা মঞ্জুরের সুপারিশের বিরোধিতা করেছিল।

একটা জিনিস অনুমান করা যায় সম্ভবত এক সময় বেদার বখ্তের সমস্ত ভাতাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজ সরকারের মঞ্জুর করা ভাতার শর্তই ছিল ২০ বছর পর্যন্ত তা চালু থাকবে, সুতরাং ১৯৪০ সালে তা বন্ধ হয়েছিল বলে ধরা যায়। আবার নিজাম সরকারের ভাতা ১।৮।১৯৫৪ তাখি থেকে যে বন্ধ হয়েছিল তা আমরা আগেই দেখেছি। পরে ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, সুলতানা বেগমের দেওয়া তথ্যানুযায়ী জানা যায় ১৯৭৭ সালে ওই অর্থের পরিমাণ ছিল ৪০০.০০ (চারশত) টাকা [১০ গ্রাম সোনা = ৪৮৬ টাকা]।

৩.৪. শাহ্জাদা মির্জা বেদার বখ্তের বিবাহ।

আত্মীয় স্বজন বলতে ছিল পাড়া প্রতিবেশী। ছিল না কোনও স্থায়ী ঠিকানা ও উপার্জনের উপায়। ১৯৬৫ সালে মির্জা বেদার বখ্ত বিবাহ করলেন, তখন তাঁর বয়স ৪৫ বছর। তাঁর এক পূর্বপুরুষ নুর মুহম্মদ জাহাঙ্গির প্রথম বিবাহ করেছিলেন ১৫ বছর ৬ মাস বয়সে এবং ১৬ বছর ৮ মাস বয়সে তিনি এক কন্যার পিতা, কেউ কেউ বলেন পত্নী ও উপপত্নী মিলিয়ে জাহাঙ্গিরের হারেমে ছিল ৩০০ জন নারী, বেদার বখ্তের প্রপিতামহ বাহাদুর শাহ জাফরের পত্নী ও উপপত্নীর সংখ্যা ৪০ জন, কারও কারও মতে ৬০ জন। তাঁর পিতামহ মির্জা জওয়ান বখ্তও মাত্র ১৭ বছর বয়সে পুত্র সন্তানের পিতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। সেই বংশের পুত্র শাহ্জাদা বেদার বখ্ত ৪৫ বছর পর্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন, বাস্তবিকই আশ্চর্য। বাহাদুর শাহ জাফরের শেষ পুত্রের যখন জন্ম হয় তখন বাদশাহের বয়স ছিল ৭০ বছর!

শোনা যায় বেদার বক্ত ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। ঈশ্বর আরাধনায় সময় কাটাতেন। ১৯৬৫ সালের ১৫ অগষ্ট তাদের বিবাহ হয়, বিবাহের সময় সুলতানা বেগমের বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর (অথবা ১২ বছর)। রাস্তার ধারে

পাথর, তাবিজ, মাদুলি, জড়িবুটি বিক্রি করা ছিল বেদার বখ্‌তের উপার্জনের একমাত্র উপায়, আর ছিল ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের মঞ্জুর করা ২৫০.০০ টাকার ভাতা [১০ গ্রাম সোনার মূল্য ১১৯.৭৫ টাকা]।

বিবাহের পূর্বে সুলতানা বেগম থাকতেন তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে ২৩, তালতলা বাজার স্ট্রিটে। ওই ঠিকানাতেই তাদের বিবাহ হয়। বিবাহের পর ২৩(অথবা ২৪) ক্যান্টোফার লেন থেকে বেদার উঠে আসেন শ্বশুর বাড়ির কাছে ২৮ নং তালতলা বাজার স্ট্রিটে, সেখানে সুলতানা বেগমকে নিয়ে ঘরভাড়া করে থাকতেন। আর্থিক সমস্যা ছিলই, ঠোঙা তৈরি, পাউরুটির প্যাকেট তৈরি, কলম তৈরি করতে হয়েছে তাদের। বিভিন্ন পাউরুটি কারখানা থেকে ছুরি সংগ্রহ করতেন তারপর রাজাবাজারে আনতে হত ধার দিতে, বিনিময়ে সামান্য অর্থ মিলত।

মির্জা বেদার বখ্‌তের জীবন থেকে কোনও দিনই আর্থিক অনটন দূর হয়নি। সামান্য স্বস্তি তিনি কোনও দিনই পান নি। একবছর বয়সে একটি শিশু বাবা ও মাকে হারাল বিবাহের পরও যে তাঁর আর্থিক দৈনতা দূর হয়েছিল এরকম কোনও প্রমাণ মেলে না।

সুলতানা বেগমের পিতা-মাতাও দরিদ্র ছিলেন, তার পিতা মুহম্মদ হালিম এবং মা মুন্নিবেগম, পিতা মুহম্মদ হালিম কলকাতার ওয়েলেসলি স্ট্রিটে ধর্মপুস্তক বিক্রি করতেন, উপার্জন ছিল সামান্যই। বিবাহ প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সুলতানা বেগম বলেন যে তাঁর এক মাসি ওই সম্বন্ধ করেন। তাদের জানানো হয় পাত্র 'আকবর বাদশাহের বংশধর'। সুন্নি পরিবারে বিবাহ হওয়ায় দীর্ঘদিন সুলতানা বেগমের লখনউর আত্মীয়গণ তাদের একরকম সামাজিকভাবে বয়কট করেন। যেহেতু বংশ মাদায় মির্জা বেদার বখ্‌ত ছিলেন অনেক উঁচুতে তাই শিয়া মতাবলম্বী মুহম্মদ হালিম ও মুন্নিবেগম ওই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন নি। বিবাহের তারিখটি ছিল মনে রাখার মতো ১৫ অগষ্ট, ১৯৬৫ সাল।

৩.৫. বেদার বখ্‌তের সন্তানগণ।

মির্জা বেদার বখ্‌তের বিবাহিত জীবন স্থায়ী হয়েছিলেন মাত্র ১৫ বছর। ১৯৮০ সালের ২২ মে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর এবং সুলতানা বেগমের পাঁচ কন্যা ও এক পুত্র জন্মায়।

১. সীমা বেগম (কমর ফতিমা) (কন্যা)

স্বামী : মুহম্মদ আসলাম (কলকাতা)

সন্তান : মহঃ ফৈজ (পুত্র), মুহঃ সমীর (পুত্র), মুহঃ শাহজহান।

ঠিকানা : এফ ২৫, শাহি আস্তাবল, গার্ডেন রিচ সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৭০০ ০২৪।

২. রৌনক জমানি বেগম (কন্যা)

প্রথম স্বামী : প্রয়াত ইরফান কাজিম ওরফে জালিম (কলকাতা)

সন্তান : রোশনয়ারা (মাতামহীর কাছেই বড় হন, রেল দপ্তরে কর্মরতা তিনি বিবাহিতা, এক পুত্র বর্তমান)

দ্বিতীয় স্বামী : ইকবাল আহমদ নবাব (মুম্বই)

পেশা : সিভিল ঠিকাদার।

সন্তান : ফ্রাহ্‌দ ইকবাল আহমদ

ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ৪১০, প্লট-৫৫, সেন্টার পয়েন্ট, সি. এইস. এস. লিমিটেড; সেক্টার২, তালোজা পঞ্চানন্দ। নবি মুম্বাই, ৪১০ ২০৮

৩. মধু বেগম ওরফে তারান্নুম জাহান (অবিবাহিতা, কন্যা, দুই ভগিনী ও মায়ের কাছে থাকেন)

৪. তনবীর বেগম

প্রথম স্বামী : মহ: জাহাঙ্গির (মৃত)

সন্তান : মুহ: জেইন (মাতামহীর কাছে থাকে)

দ্বিতীয় স্বামী : আবু বক্‌র সিদ্দিকি (কলকাতা)

পেশা : গাড়ি চালক

সন্তান : সুজাত আলি সিদ্দিকি, আমানত আলি সিদ্দিকি;

সমর তালি সিদ্দিকি, রহমান আলি সিদ্দিকি (চারপুত্র)

ঠিকানা কোনও স্থায়ী বাসস্থান নেই।

৫. জিনাত মহল (কন্যা)

স্বামী : মুহম্মদ আকবর শেখ (কলকাতা)

পেশা : গাড়ি চালক, বর্তমানে ফলের রস বিক্রি করেন।

সন্তান : মুহঃ নবি আকবর শেখ, রাইহাস আকবর শেখ

ঠিকানা : স্থায়ী ঠিকানা নেই, তবে মহারাষ্ট্রের থানে জেলায় মীরা রোড (পূর্ব) অঞ্চলে বসবাস করেন, যখন তখন ঠিকানা বদল করতে বাধ্য হন।

৬. মুহম্মদ কামাল বখ্‌ত (পুত্র)

পেশা : ট্যাক্সি চালক, মাতামহীর কাছে থাকেন।

ঠিকানা : প্রযত্নে মুন্নি বেগম, ১২ বি রামশংকর রায় লেন, তালতলা, কলকাতা১৪ এবং মায়ের কাছেও মাঝে মাঝে থাকেন।

৩.৬. বেদার বখ্‌তের অসুস্থতা ও মৃত্যু ।

শাহজাদা মির্জা বেদার বখ্‌ত প্রথম মারাত্মক অসুস্থ হন ১৯৭৯ সালের জুন মাসে। শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। চিকিৎসার পর খানিকটা সুস্থ হন। এরপর ঠিক প্রায় এক বছর বাদে তিনি আবার অসুস্থ হন এবং সমস্ত শরীর পক্ষাঘাতে প্রায় অচল হয়ে পড়ে। ভর্তিকরা হয় নিকটস্থ নীলরতন সরকার হাসপাতালে ১৯৮০ সালের ১৯ মে তারিখে। ১৯।৫।১৯৮০ থেকে ২১।৫।১৯৮০ পর্যন্ত তাঁর চিকিৎসা চলে ২২ মে তারিখে তিনি হাসপাতালেই মারা যান। তিলজলার ১নং রাইচরণ পাল লেনস্থিত সমাধি প্রাঙ্গনে তাঁকে সমাধি নেওয়া হয়। হৃদপিণ্ডের কার্যক্ষমতা ব্যর্থ হওয়ার কারণে তিনি মারা যান, ২৩।৫।১৯৮০ তারিখে তাঁকে সমাধি দেওয়া হয় [পরিশিষ্ট১০ দ্রষ্টব্য]।

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়াত শাহ্‌জাদা মির্জা মুহম্মদ বেদার বখ্‌ত বাহাদুরের সম্মানার্থে পুলিশ রাইফেল থেকে তিনবার গুলি ছোঁড়া হয়। সেদিন শাহ্‌জাদা প্রায় কপর্দকশূন্যই ছিলেন যে সম্মান জীবদ্দশায় পান নি মৃত্যুর পর খানিকটা হলেও তা লাভ করলেন।

পশ্চিমবঙ্গ খানদান
একাকী সুলতানা

৪.১. শাহ্‌জাদার মৃত্যু পরবর্তী সংকট ও জীবন সংগ্রাম ।

১৯৬৭ সালের ১৬ নভেম্বর চতুর্থ লোকসভা সচিবালয় থেকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে মির্জা মুহম্মদ বেদার বখ্‌ত কে 'হিজ্ রয়্যাল হাইনেস প্রিন্স মির্জা মুহম্মদ বেদার বখ্‌ত অব ক্যালকাটা' বলে উল্লেখ করা হয়েছিল [যা রয়েছে পরিশিষ্ট ১০ উল্লিখিত শংসা পত্রে]। সেই শাহ্‌জাদার মৃত্যুর পর তাঁকে প্রদেয় ভাতাটি ও বন্ধ করে দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। দ্রুততার সাথে সুলতানা বেগম কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সকাতর আবেদন করেন, ৬টি সন্তানের জননী তখন অথৈ জলে। সুলতানা বেগমের বয়স তখন ২৭ অথবা খুব বেশি হলে ২৮ বছর।

১৯৮০ সালের ৫ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্টমন্ত্রক (গৃহ মন্ত্রালয়) সুলতানা বেগমের পেনশনের বিষয়ে অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল অব ওয়েষ্ট বেঙ্গলকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। বাহাদুর শাহ জাফরের প্রয়াত প্রপৌত্রের বিধবা পত্নী সুলতানা বেগমের রাজনৈতিক পেনশন যে পাওয়া উচিত তা ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছিল। ভারত সরকারের পক্ষে সহসচিব প্রেমকুমার চিঠিটিতে স্বাক্ষর করেন। চিঠিটি হুবহু তুলে দেওয়া হল—

No. 53/2/80-FF(P)
Department of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affaires/Grih Mantralaya
New Delhi-110003
Date : 5, December, 1980

To
The Accountant General,
West Bengal
Calcutta

Sub : Grant of department political pension to Smt. Sultana Begum widow of Late Mirza Mohd, Bedar Bukhit, Great Grandson of Last Moughal Emperor late Bahadur Shah Zafar-II from entral Revenues.

I am directed to onvey the sanction of the President of the grant of the dependent politial pension to Smt. Sultana Begum Widow of late Mirza Mohd. Bedar Bukht resident of 24, antopher Lane, Calcutta @ Rs. 400/- (Rupees four hundred) only p.m. w.e.f. 1-8-1980 from Central Revenue. This sanction has been agreed to as a very special case on account of the exceptional nature of the case and on humanitarian consideration. This pension will be tenable during her life time and terminable on her remarriage.

2. The expenditure involved will be debitable to the Major Head 266 Misellaneous General Service 0.2 Donations and Awards in consideration of Distinguished services C.2 (1) donations granted after independence for Political consideration under grant No. 52-Other expenditure of the Ministry of Home Affairs during the year 1980-81. Necessary funds will be provided by re-appropriation in due course.

3. It is requested that immediate arrangement be kindly made for the payment of pension and pension payment order issued to her. She has been advised to contact the concerned Treasury Offier / Sub- Treasury officer on receipt of PPO from you and to submit to him (in duplicate) her photograph descriptive roll (i.e. two prominent identification marks) specimen's signature, left hand thumb and finger impression and date of birth duly attested by the D.C/Collector of the District or by any of his subordinate Revenue Officer in the District not below the rank of a Tehsildar.

This issue with the concurrence of the Ministry of Finance.

Attested
J.P. Bhatnagar

Yours faithfully,

Sd/-
(PREM KAPUR)
(Deputy Secretary of the Government of India)

Copy forwarded for information to :

1. The Chief Secretary, Government of West Bengal, Calcutta.
2. Smt. Sultana Bengum wife to Late Mirza Mohd. Bedar Bukht, resident of 24, Cantopher Lane, Calcutta.
3. The District Collector, Calcutta.
4. The Treasury Officer, Calcutta.
5. Sanction folder,
6. Finance IIII Sanction
7. Accounts-I Section.
8. One spare copy.

Sd/-
(PREM KAPUR)
(Deputy Secretary of the Government of India)

সুলতানা বেগম যাতে দ্রুত পেনশন পান তার জন্য ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গের মহা-গাণনিককে। একথা ভাববার কোনও কারণ নেই যে অসহায় সুলতানা বেগম তাঁর আবেদন পত্র দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সহকারী সচিব পশ্চিমবঙ্গের মহা-গাণনিককে পেশশন দিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন।

১৯৮০ সালের অগষ্ট মাসে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির লোকসভার সদস্য সম্মাননীয় প্রয়াত শ্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত লোকসভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে তিনটি প্রশ্ন করেছিলেন (প্রশ্নের ক্রমাঙ্ক ৮৭১), 'সম্মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কি জানেন—

(ক) শেষ মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরের প্রপৌত্র শাহ্জাদা মির্জা মুহম্মদ বেদার বখ্ত বাহাদুর কলকাতায় ১৯৮০ সালের ২৯ মে[১] মারা গিয়েছেন?

(খ) এটা কি বাস্তব ঘটনা যে তিনি নিদারুণ আর্থিক কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন, যেমন মীর জাফরের বংশধরগণ আছেন।

(গ) ওই দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের পেনশন মঞ্জুরের ব্যাপারে সরকার কি কোনও ভাবনা চিন্তা করছে?'

সেই সময়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মননীয় শ্রী যোগেন্দ্র মাকওয়ান তিনটি প্রশ্নের উত্তর একই সঙ্গে জানান। তিনি বলেন, (ক), (খ) এবং (গ) তিনটি প্রশ্নের উত্তর হল এই যে—

সরকারের নজরে এসেছে যে মির্জা মুহম্মদ বেদার বখ্‌ত কলিকাতায় ১৯৮০ সালের ২৯ মে[১] তারিখে মারা গিয়েছেন। তাঁকে প্রতিমাসে ৪০০.০০ (চারশত) টাকা হারে আজীবন সহানুভূতিশীলতার কারণে পেনশন দেওয়া হত। যদি তাঁর পরিবারের সদস্যগণ সরকারের কাছে কোনও অনুরোধ করে তবে সরকার অবশ্য তা সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করবে।

যাই হোক ৫।১২।১৯৮০ তারিখে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে পাঠানো ক্রমাঙ্ক ৫৩/২/৮০ এফ. এফ. (পি) অনুসারে পুনরায় পেনশন প্রদান আরম্ভ হয় এবং অনেকগুলি নাবালক সন্তান নিয়ে সুলতানা বেগম সামান্য হলে স্বস্তি পেলেন। অর্থ বিভাগের অনুমতি নিয়েই যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ওই চিঠি দিয়েছিলেন তা চিঠির শেষ বাক্যটিতে জানিয়েছিল (অনুচ্ছেদ ৪)।

টীকা :

(১) শাহ্‌জাদা মির্জা বেদার বখ্‌ত মারা যান ১৯৮০ সারে ২২ মে, সুতরাং প্রশ্ন ও উত্তর উভয় জায়গাতেই ভুল আছে।

৪.২. বাসস্থান সংক্রান্ত স্বস্তি ও অস্বস্তি ।

এই ঘটনার পর সুলতানা বেগম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আর একটি কাজ করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে একটি আবেদন পত্র জমা দেন। ৪।৬।১৯৮১ তারিখের ওই আবেদনে সম্মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি দুই কক্ষ বিশিষ্ট ফ্ল্যাট দেওয়ার অনুরোধ করেন। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সম্মাননীয় প্রয়াত শ্রী জ্যোতি বসুর আন্তরিকতায় ৪।৭।১৯৮১ তারিখে ১৬৪/পিএস/এম এল জি স্মারক সম্বলিত চিঠি পাঠানো হয় নাগরোন্নয়ন বিভাগ থেকে। ওই চিঠি দিয়ে সুলতানা বেগমকে ২৮, তালতলা বাজার স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০ ০১৪ ঠিকানায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে ওই সময় কলিকাতা ইম্প্রভমেন্ট ট্রাষ্টের অধীন মুসলিম এলাকায় কোনও দুই কক্ষ বিশিষ্ট ফ্ল্যাট ফাঁকা ছিল না। তাঁর অবগতি ও বিবেচনার জন্য আরও জানানো হয় যে প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড ঠিকানায় একটি এক কক্ষ বিশিষ্ট ফ্ল্যাট ছিল, যদি তিনি ওই এক কামরা বিশিষ্ট ফ্ল্যাট নিতে ইচ্ছুক হন তবে তা যেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানান। ওই এক কামরার ফ্ল্যাটে তাঁর প্রয়োজন মিটবে কি না জানতে চাওয়া হয়েছিল।

এরপর সুলতানা বেগম তাঁর সম্মতি সূচক চিঠিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠিয়ে দেন। তাঁর সম্মতিসূচক চিঠিটি পেয়ে এস্টেট ম্যানেজার, কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট

ট্রাষ্ট, এষ্টেট ডিপার্টমেন্ট,পি-১৬, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেনশন, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ পক্ষ থেকে সুলতানা বেগম কে জানানো হয় ওই ফ্লাটের মাসিক ভাড়া ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা এবং সার্ভিস চার্জ বাবদ প্রতি মাসে ৫.০০ (পাঁচ) টাকা, মোট পঞ্চান্ন টাকা করে দিতে হবে, স্মারক ক্রমাঙ্ক ই এম/৭৯৪, তাং ২২।৭।১৯৮১, সুলতানা বেগমের কাছে ওই চিঠি পৌছয় তার পরের দিনই।

ওই চিঠির প্রেক্ষিতে ১৯।৭।১৯৮১ তারিখে তিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগে ২২০.০০ (দুইশত কুড়ি) টাকা জমা দেন। তার মধ্যে ছিল

অগষ্ট মাসের ভাড়া = ৫০.০০
সার্ভিস চার্জ = ৫.০০ এবং
সিকিউরিটি চার্জ বাবদ= ১৬৫.০০

২২০.০০

ফ্ল্যাটের বিবরণ ছিল নিম্নরূপ : ফ্ল্যাট ক্রমাঙ্ক ১১, ব্লক-৫, সি আইটি বস্তি পুনরোন্নয়ণ স্কিম ক্রমাঙ্ক ১১৪-এ, লেক গার্ডেন, কলিকাতা-৭০০ ০৪৫।

১৯৮১ সালের অগষ্ট মাসে সন্তানদের নিয়ে ফ্ল্যাটে প্রবেশ করলেন সুলতানা বেগম। প্রতিমাসে ৫৫.০০ (পঞ্চান্ন) টাকা জমা দিতে হত, ৬ জন সন্তান নিয়ে ৪০০.০০ (চারশত) টাকা পেনশনে সংসার চালানো ছিল বিস্তর সমস্যা, কিন্তু যে ফ্ল্যাটটি তিনি পেয়েছিলেন তা ছিল তাঁর এবং তাঁর সন্তানদের কাছে প্রাসাদ তুল্য। কিন্তু তিনি তো প্রয়াত শাহ্জাদা মির্জা বেদার বখ্তের বেগম, স্বস্তি, সুখ, শান্তি, নিশ্চিন্ত জীবন যাপন তো তাঁর থাকা মানায় না, সুতরাং প: ব: সরকার প্রিন্স আনোয়ার শাহ্ রোডস্থিত কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের অধীন ৫ নং ব্লকের যে ১১ নং এক কামরার ফ্ল্যাটটি সুলতানা বেগমের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন এবং তিনি ওই ফ্ল্যাটে থাকতেও আরম্ভ করেছিলেন, সমস্যার সূত্রপাত হল সেই এক কামরার ফ্ল্যাটটিকে কেন্দ্র করেই। ২৮ নং তালতলা বাজার স্ট্রিটের ভাড়া বাড়ি ছেড়ে তিনি গিয়ে উঠেছিলেন ওই ফ্ল্যাটটিতে ২০।১২।১৯৮৩ তারিখে। সুলতানা বেগম অভিযোগপত্র জমা দেন লালবাজার স্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কলিকাতা পুলিশ কমিশনার, কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের এষ্টেট ম্যানেজার এবং স্থানীয় লেক পুলিশ থানায়। সেখানে যে বিষয়টি নিয়ে গোলমাল আরম্ভ হল তা নিচে তুলে ধরছ।

'১১ নং ফ্ল্যাটটি সুলতানা বেগম কে বরাদ্ধ করার আগে জনৈক রঘু খান অবৈধভাবে ওই ফ্ল্যাটটি নিজের দখলে রেখেছিল। এর জন্য সরকারের কাছে থেকে তার কোনও বৈধ কাগজ ছিল না এবং সরকারকে ওই ১১ নং ফ্ল্যাটটির জন্য রঘু খান কোনও টাকাও দিত না। সে নিজে বৈধ কাগজ ছাড়াই থাকত পাশের ১০ নং ফ্ল্যাটটিতে। সে বাস করতে ১০ নং ফ্ল্যাটে, আর ১১ নং ফ্ল্যাটে অবৈধ সাট্টার কারবার চালাত, স্বাভাবিকভাবে সুলতানা বেগম এবং তাঁর সন্তানেরা সরকারের অনুমোদিত বাসিন্দা হিসাবে আসায় সে বেশ সমস্যায় পড়ল। যখন ফ্লাটটিতে সুলতানা বেগম থাকতে আরম্ভ করলেন পূর্বোক্ত রঘু খান তাঁর স্ত্রীর মাধ্যমে সুলতানা বেগমকে এককালীন ২০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা নিয়ে ফ্ল্যাটটি পরিত্যাগ করার প্রস্তাব দেয়, যথারীতি সুলতানা বেগম ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। প্রকৃতপক্ষে ১০ নং ফ্ল্যাটটি বরাদ্দ করা হয়েছিল জনৈক ভীমচাঁদ সরদারের নামে, ওই একই পদ্ধতিতে রঘু খান ভীমচাঁদ কে সরিয়ে দেয়।

১৯ নভেম্বর, ১৯৮৩ সি. আই. টি.র পক্ষ থেকে ভীমচাঁদ সরদারের নামে একটি বিজ্ঞপ্তি আসে, খুব স্বাভাবিকভাবে ভীমচাঁদ কে না পেয়ে (পাওয়ার কথাও নয়) সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব প্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ্যে দরজায় টাঙিয়ে দেন এবং সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করেন সুলতানা বেগম। তারপর থেকে রঘু খানের স্ত্রী ও পুত্র আরও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং ভয় দেখাতে আরম্ভ করে।

বিগত দুবছর ধরে তারা চেষ্টা করেছিল ১১ নং ফ্ল্যাট থেকে সুলতানা বেগমদের তাড়িয়ে দিতে। কিছুতেই যখন সফল হল না মারাত্মক ক্রুদ্ধ হয়ে তারা অন্যপথ ধরল। 'তারা নিয়মিতি আমার অল্প বয়সি মেয়েদের দলে টানতে থাকে এবং স্বাভাবিকভাবে আমি তাতে প্রতিবাদ করি, কিন্তু তারা আমার মেয়েদের সমর্থন করতে থাকে। ইদানিং আমার মেয়েরা যেন আমার বিরুদ্ধে সরব হচ্ছিল।'

১৯। ১২। ৮৩ তারিখে অর্থাৎ অভিযোগপত্র জমা দেওয়ার আগের দিন ভিত্তিহীনভাবে রঘু খানের স্ত্রী, পুত্র এবং ভগিনী বেগমের মেয়েদের সমর্থন করতে থাকে। বেগমের ধর্ম ভাই, এর প্রতিবাদ করলে রঘু খানের দলবল ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে আক্রমণ করে, শারীরিক ভাবে নিগ্রহ করে। সুলতানা বেগম নিরাপত্তা চান এবং সরকারি আবাসন থেকে সমাজবিরোধী রঘু খানকে উচ্ছেদ করবার আবেদন জানান।

ওই আবেদনের প্রেক্ষিতে ৯।১।১৯৮৪ তারিখে একটি তদন্ত হয়, তদন্তকারী আধিকারিক ছিলেন জনৈক এস. আর. ব্যানার্জী তিনি তদন্তের সময়

অভিযোগকারীর সঙ্গেই কথা বললেন না। সমস্ত বিবরণ জানিয়ে সুলতানা বেগম ৯।২।১৯৮৪ তারিখে লালবাজারের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অ্যান্টি রাউডি বিভাগে চিঠি জমা দেন। কাজের কাজে কিছুই হয়নি।

৪.৩. হিন্দু না ওরা মুসলিম।

প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডস্থিত সরকারি আবাসনকে কেন্দ্র করে যখন বিস্তর গোলমাল চলছিল ৯।২।১৯৮৪ তারিখে সুলতানা বেগম তিন পৃষ্ঠার এক বিস্তারিত প্রতিবেদন অভিযোগ আকারে জমা দিয়েছিলেন লাল বাজরের অ্যান্টি রাউডি বিভাগে, তার অনুলিপি পাঠান কলিকাতা পুলিশ কমিশনার, নতুন দিল্লির পুলিশ কমিশনার, কলিকাতা পুলিশ কমিশনার, কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের এষ্টেট ম্যানেজার এবং কয়েকটি সংবাদ পত্র বিভাগে।

ওই চিঠি থেকে জানা যায় সমাজব্যবস্থার বাস্তব ছবি, সে ছবি ব্যক্তিগত স্বার্থ মেটানোর, সে ছবি নোংরা, কদর্য চরিত্রের। সুলতানা বেগমের স্বামী শাহ্‌জাদা মির্জা বেদার বখ্‌ত যখন মারা যান তখন সুলতানা বেগম মাত্র ২৭ বা ২৮ বছরে যুবতী, তিনি দেখতেও ছিলেন সুন্দর এবং আকর্ষণীয়া। স্বামী মৃত, পেনশন বন্ধ, সংসারে ৬ জন সন্তানসহ ৭টি মানুষ, শকুনেরা, শৃগাল, হায়নার দল ঘুরঘুর করত অশেপাশে, সুলতানা বেগম অকপটে লিখেছেন : 'আমার স্বামীর মৃত্যুর পর আমার মা ও নিজের ভাইরা আর্থিকভাবে বঞ্চনা করতে সচেষ্ট হল, আমার স্বামীর বন্ধুরা আমার অসহায়তার সুযোগে যৌন নিগ্রহ করার চেষ্টা করত, কুপ্রস্তাব পাঠাত, আমার ধর্ম-ভাই পরবন্‌ত সিংহ মৈহারি একাধিক বার একাধিকভাবে আমার সাহায্যে করেছেন, তিনিই আমার পেনশন চালু থেকে, প্রিন্স আনোয়ার শাহ্‌ রোডস্থিত ফ্ল্যাটটি পেতে সহায়তা করেছেন।'

এই সময় জ্যেষ্ঠাকন্যা সীমা বেগমের বয়স ১৪ বছর, দ্বিতীয় রৌনকের ১১ বছর, তৃতীয় মধু ওরফে তারান্নুম বেগমের ৯ বছর, তনভির বেগমের ৭ বছর এবং কনিষ্ঠা কন্যা জিনাত মহল বেগমের বয়স ছিল মাত্র ৫ বছর এবং একমাত্র পুত্র মির্জা মুহম্মদ কামাল বখ্‌ত তখন মাত্র কয়েক বছরের শিশু।

পরবন্‌ত সিংহ মৈহারি ওরফে পাল সিংহ মৈহারি পেশায় ছিলেন একজন অখ্যাত সাংবাদিক, তরতাজা শিখ যুবক, বয়স ৩০ বছর বা ৩২ বছর। মির্জা বেদার বখ্‌ত মারা যাওার পর থেকে তিনি সুলতানা বেগমকে সাহায্য করতে থাকেন। দিল্লিতে পেনশনের জন্য দরবার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে ফ্ল্যাটের জন্য অনুরোধ, বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগপত্র পেশ প্রভৃতি সমস্ত কিছু তিনিই

করতেন। পরবন্‌ত সিংহের এক বন্ধু দিল্লিবাসী দীপ ওরফে প্রদীপ সিংহ তৃতীয়া কন্যা তারান্নুম ওরফে মধুকে নিয়ে যান, পাঁচ, ছয় জন সন্তান নিয়ে তখন সুলতানা বেগমের নাজেহাল অবস্থা। রঘু খান এবং তার দলবল নিশানা করে পরবন্‌ত সিংহকে তিনিই যে আসল মস্তিষ্ক তারা বুঝতে পারে। সেই সময় পরবন্‌ত সিংহ মৈহারি সুলতানা বেগমের সঙ্গে ওই একই ফ্ল্যাটে থাকতেন এবং সুলতানা বেগম তাঁকে 'ধর্মভাই' মানতেন (এখনও মানেন)। রঘু খানের দলবল পরবন্‌ত সিংহকে ওই ফ্ল্যাট থেকে বার করার চেষ্টা করে এবং ১৯।১২।১৯৮৩ তারিখে তারা শিখ যুবকের উপর আক্রমণ শানায়। ওই দিন ১১ নং ফ্ল্যাটে জোর করে ঢুকে পরবন্‌ত সিংহের সমস্ত জিনিসপত্র টান মেরে রাস্তায় ফেলে দেয় এবং ফ্ল্যাট পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেয় এবং শাসায়। ওইদিন সন্ধ্যায় এক বস্ত্রে তিনি ওই ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে আসেন।

ইতিমধ্যে রঘু খানের দলবল অন্য কৌশলও নিয়েছিল, তারা সুলতানা বেগমের দুই কিশোরী কন্যা সীমা এবং রৌণককে হাত করে। হরিয়ানাবাসী এক ভদ্রলোক তারনুম কে দত্তক নিতে চেয়েছিলেন, দীপ (প্রদীপ) সিংহের মাধ্যমে তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারান্নুমকে নিয়ে প্রদীপ সিংহ তখন দিল্লি ছিলেন। সীমা এবং রৌনকের মাধ্যমে দুটি অভিযোগ আনার চেষ্টা করল রঘু খান এবং তার দলবল। মূলত অভিযোগের নিশানায় ছিল পরবন্‌ত সিংহ মৈহারি এবং প্রদীপ সিংহ। পরবন্‌ত সিংহের বিরুদ্ধে বলা হল তিনি একটি মুসলিম পরিবারকে হিন্দু ধর্মে বদলানোর চেষ্টা করছেন এবং প্রদীপ সিংহের বিরুদ্ধে বলা হল তিনি তারান্নুমকে অপহরণ করেছেন এবং পরবন্‌ত সিংহ মৈহারি ওই অপহরণে সহায়তা করেছেন। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, উত্তেজনা তৈরির প্রচেষ্টা আরম্ভ হল খুব সচেতনভাবেই।

রঘু খান এবং তার দলবলের ইন্ধনে এই সময় সীমা এবং রৌনক সম্পূর্ণভাবে সুলতানা বেগমের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল, তারাও চাইছিল না 'বিধর্মী' শিখ যুবক পরবন্‌ত সিংহ মৈহারি তাদের সঙ্গে একই ফ্ল্যাটে থাকুক। রঘু খান ও তার দলবল বাইরে প্রচার করতে থাকে যে সুলতানা বেগমের সঙ্গে পরবন্‌ত সিংহ মৈহারির অবৈধ সম্পর্ক আছে, সম্ভবত, সীমা এবং রৌনকের মাথায় তা ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং তারা তা বিশ্বাস করতেও আরম্ভ করে।

সুলতানা বেগম জানিয়েছেন :

'একথা বলতে আমার সামান্য দ্বিধা নেই যে হিন্দুরাও আমাকে এবং আমার

প্রয়াত স্বামীকে একাধিকবার স্বার্থশূন্য ভাবে সহায়তা করেছে। আমরা কোনও রকম সমস্যায় পড়লেই এরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।'

শেষ পর্যন্ত ওই ফ্ল্যাটটি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন সুলতানা বেগম, প্রশাসনের দরবারে বারবার জানিয়েও অবৈধ দখলকার অসামাজিক রঘু খানকে ১০ নং ফ্ল্যাট থেকে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি। প্রশাসনের একাংশের মদতে সেখানে বসেই সে অবৈধ ব্যবসা চালাত। প্রিন্স আনোয়ার শাহ্ রোডস্থিত সেই ১১নং ফ্ল্যাট (ব্লক-৫) অতীত হয়ে গেল সুলতানা বেগমের কাছে। তিনি হলেন পুরোপুরি নিরাশ্রয়।

৪.৪. আশ্রয়ের সন্ধানে হাওড়ায়।

জালাল উদ্দিন মুহম্মদ আবদুল ফতে আকবর বাদশাহের বংশের বেগম নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরতে লাগলেন পথে পথে। কখনও দিল্লি, খড়গপুর বা বকুলতলা চাঁদমারি রোডে। শেষে ১৯৮৪ সালে আসেন হাওড়ার ফোরশোর রোডে। কাউসঘাট এলাকায় বার্ডকলোনির (প্রকৃতপক্ষে বস্তি) ১০৩/১২/সি, হাওড়া ১০২ ঠিকানায় উঠে এলেন সন্তানদের নিয়ে, সাথে এলেন সেই 'ধর্মভাই' পরবন্ত সিংহ মৈহারি। ৮ ফুট × ১০ ফুট মাপের দুটি ঘর ভাড়া নেওয়া আছে পরবন্ত সিংহের নামে। ১৯৮৪ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত সুলতানা বেগম রয়েছেন ওই ঠিকানাতেই। এখানে এসে আরম্ভ হল সেই জীবন সংগ্রাম, বেঁচে থাকবার জন্য এক কঠিন লড়াই। ভরসা মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া মাসিক ৪০০ টাকার পেনশন। এইভাবেই কাটতে থাকে সুলতানা বেগমের বৈচিত্রহীন জীবন। লালবাজার থেকে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর ছুটেও রক্ষা করতে পারেন নি সরকারেই দেওয়া আবাসন, ১৯৮৫ সালে তা সমর্পণ করতে বাধ্য হন। সুলতানা বেগমের ভাষায় :

'স্থানীয় থানা, লালবাজারের কর্তা থেকে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত হাজার অভিযোগ জানালেও আমার কান্না কারও পাষাণ হৃদয়কে গলাতে পারেনি। ...শূন্য হাতে একবস্ত্রে সরকারি আবাসন ছেড়ে রাজাবাজার, হাওড়ায় একটি মন্দিরে, বিভিন্ন বাড়িতে, খড়গপুর এমনকী দিল্লিতেও আশ্রয়ের খোঁজে ঘুরেছি। কোথাও পাকাপাকি ঠাঁই হয়নি। শেষে সর্দার জি আমাকে এখানে ঠাঁই দেন তারই ঘরে। তাও হয়ে গেল প্রায় ৩০ (ত্রিশ) বছর। আমার ও আমার মেয়ের ইজ্জত রক্ষা করেছেন তিনি। ...ওকে আমি ভাই মেনেছি। ওর কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। আমার পর আর কেউ আমাদের বংশ মর্যাদা নিয়ে মাথা ঘামাবে বলে মনে হয় না। সমস্ত রকম দুর্দশায় থেকে ছেলে-মেয়েরা বলে, এই ছবি, দলিল-দস্তাবেজ এসব নিয়ে কি ধুয়ে খাব? আমাদের গতর খাটিয়েই খেতে হয়।'

ভালো রোজগারের আশায়, সোনালি ভবিষ্যৎ ও সুখের প্রত্যাশায় মির্জা কামাল বখ্‌ত (একমাত্র পুত্র) গিয়েছিলেন সৌদি আরবে। সেখানকার পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে পারছিলেন না, তিনি বাধ্য হয়েছেন স্বদেশে ফিরে আসতে। যে নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে গিয়েছিলেন, তা মেলেনি। অভিমানিনী সুলতানা বেগম বলেন :

'আমাদের এত দুর্দশায় জীবন কাটে কিন্তু বাহাদুর শাহ জাফর মেমোরিয়াল কমিটি তো কোনও খোঁজ নেয় না। রাজ্য সরকার আমাদের দাবিকে গুরুত্ব দেয় না। ১৫ অগষ্ট আমার বিবাহের দিন, আমার বংশ মর্যাদা আর বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে স্বাধীনতা দিবস ভালো লাগত না, মন খারাপ হত।'

৪.৫ প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারি বাজপেয়েজি কর্তৃক আর্থিক সাহায্য দান।

২০০৩ সালে সুলতানা বেগম ফোরশোর রোডের পাশে একটা ছোট্ট চায়ের দোকান দেন। দোকানে এক পাশে টাঙিয়ে রাখতেন পরম যত্নে রাখা বাহাদুর শাহ্ জাফরের ছবি। তার আগে অনেকেই জানতেন না তিনি মোগল বংশের পুত্র বধূ। ব্যস্ত ফোরশোর রোডে চায়ের দোকান আরম্ভ করার দৌলতে অনেক লোকের নজরে আসেন। বিভিন্ন ছোটো ছোটো সংবাদ বিভিন্ন খবরের কাগজে প্রকাশ হতে থাকে। এরকম একটা অতি ছোটো সংবাদ চোখে পড়ে তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী স্বামী চিন্ময়ানন্দজির। তিনি বষয়টি নিয়ে সম্মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটল বিহারি বাজপেয়েজির সঙ্গে আলোচনা করেন এবং সুলতানা বেগম কে চমকে দিয়ে ২০০৩ সালের ১৫ অগষ্ট ফোরশোর রোডের ওই বস্তি বাড়িতে সামান্য উপহার নিয়ে উপস্থিত হন স্বামী চিন্ময়ানন্দ জি মহাশয়। সুলতানা বেগমের বাস্তব অবস্থা দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। চায়ের দোকান থেকে আয় হত অতি সামান্য। তাঁর কথায় :

'লোকের বাড়ি কাজ করার চেয়ে চায়ের দোকান চালানো ছিল অনেক বেশি মর্যাদাকর। তাছাড়া আমি যে ভিক্ষা করব, আমার বংশ মর্যাদা তাঁকে বাধা দেয়।'

২০০৩ সালে ২৪ অগষ্ট 'টাইমস্ অব ইন্ডিয়া'র কলিকাতা সংস্করণে রবিবারে সুমতি ইয়েঙ্গহম সুলতানা বেগমকে নিয়ে একাধিক ছবিসহ একটা বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেন এবং এর পরই ব্যাপক হৈ-চৈ আরম্ভ হয়। তার কিছুদিন বাদে সাংবাদিক হারাধন চৌধুরি দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র 'বর্তমান'-এ আর একটি প্রতিবেদন তুলে ধরেন এর ফলে বাংলার আপামর জনগণ জানতে পারল শেষ মোগল বাদশাহের বংশধরের বিধবা পত্নীর দুর্দশার কথা। 'দ্যা টাইমস্ অব

ইন্ডিয়ার ওই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি পাঠকের কৌতূহল নির্ধারণের জন্য উল্লেখ করা হল :

● **The sunday times 24/8/2003** ●

The last of the Great Mughals, Bahadur Shah Zafar, died a broken and dejected man in exile in what was then Rangoon. His cursed fate seems to be haunting his descendants.

Aeons removed from teh pomp of the Mughal court, a great granddaughter-in-law of Bahadur Shah is eking out a living near the Howrah station. Sultana Begum, who claims to be the wife of the great grandson of Bahadur Shah, runs a roadside tea stall to feed her family. An unexpected intervention by the Union minister of State for home Swami Chinmayanand, who chanced upon a story in a magazine on Sultanas condition, may however see a change of fortunes.

Speaking to *The Sunday Times of India,* he said 'I have asked my ministry to get concrete proof of her lineage. On ascertaining the facts, we shall decide how best to rehabiliate her. I am thinkking of providing her a home, a job and other financial benefits,' The minister even paid her a visit at her tenement at the Birds Colony in Howrah on August 15. 'I was in Kolkata, so I decided to meet her. Her case seems geneuine.'

Chinmayanand presented Sultana with a shawl and sweets. The minister also asured Sultana that the government would provide her a house and enhance the allwance by the state. Showing off the shawl that the minister presented her, Sultana acknowledged that the minister's visit has made her a celebrity of sorts in the slum. 'people are curious to know more about my family's regal past,' she said.

Sitting inside her tiny tea stall on Foreshore Road, the 50 years old Sultana narrates her illustrious lineage to anyone who cares to listen. She married Mirza Muhammad Bedar Bhkht, the great grandson of BahadurShah Zafar. In 1965 when she was only 12 years old.

Bakht used to sell semi-precious stones on the pavements of Kolkata as the Rs 400 monthly pension doled out by the Indian

Government was too meagre for survival. After her husband's death in 1980, even this paltry payout was stopped and Sultana was left to feed for her five daughters and son. She says life has been one continuous struggle for her.

Prince and the pauper

This is a tale of a woman who could have been a rani, but now sells tea in Howrah. The great granddaughter-in-law of Bahadur Shah Zafar has lost her husband, money and fame. her royal past has been further sullied by local goons who forcibly took away a government flat allotted to her. Sumati Yengkhom looks at this royal fall and the neglect that goes with it especially after her husband's death.

'It was though making ends meet. I swallowed my pride and took up the job of a daily wage earner to keep the fire at our Metiabruz home burning. She recalls. She adds bitterly that the Bahadur Shar Zafar Memorial Committee has never attempted to contact her.

That's when the late CPI MP Indrajit Gupta heard of her plight and look the matter up in Parliament, leading to the revival of the government allowance by then Union minister of state for home Yogendra Makhwana.

The West Bengal government in 1981 even allotted a CIT fat to Sultana in Lake Gardens. 'For the first time in several years, life was beginning to look better,' Sultana says.

But her happiness was shortlived. Thereatened by local goons, she and her family were forced to vacate the flat in 1983. 'My daughters, too, faced a lot of harassment by satta dons who wanted to use the flat,' says Sultana. A visit to the flat revealed that it has been taken over by local gangstar Rughu Khan. The local police station is in the dark about the incident.

Since then, Sultana has been living in Howrah. The tea stall is all she has to show apart from the tiny 6 by 11 feet dingy room where she lives with her youngest daughter. Her only son is working as a cook in Saudi Arabia. Giving Sultana company is

Parbant Singh Maihari, an employee of a small Hindi newspaper, who befriended the begum inher darkest days.

Though Sultana makes as little as Rs 70, she refuses to give up. Running a tea stall is more dignified than working as a house maid. Dignity would not permit me to beg for aims.' says Sultana, flashing a spirit that would have made her *khandaan* proud.

৪.৬. মাননীয়া মমতা ব্যানার্জী, কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রী এবং মাননীয় প্রয়াত তপন সিকদার, টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রীর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান।

২০০৩ সালের ১৫ অগষ্ট স্বামী চিন্ময়ানন্দ জির মাধ্যমে কেবলমাত্র একটি শাল ও মিষ্টি পাঠিয়ে চুপচাপ বসেছিলেন না প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটল বিহারি বাজপেয়িজি। ২০০৪ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় কয়লা প্রতিমন্ত্রী মাননীয়া শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং টেলি ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী মাননীয় প্রয়াত তপন সিকদারের (অধুনা প্রয়াত) মাধ্যমে এককালীন ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অনুদান ও কিছু স্মারক উপহার পাঠান। ২৭।২।২০০৪ তারিখে The Times of India সংবাদপত্রের কলিকাতা সংস্করণে (পৃষ্ঠা ৩) বিস্তারিত প্রতিবেদন তুলে ধরে, তা থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় কিছু অংশের বাংলা অনুবাদ তুলে দিচ্ছি—

চল্লিশ বছর ধরে যে কষ্ট সহিষ্ণু নারী সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছেন বৃহস্পতিবার যখন মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে দীর্ঘ ও উষ্ণ আলিঙ্গনে জরিয়ে ধরলেন তিনি চোখের জল রোধ করতে পারলেন না।

কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রী তাঁর সহকর্মী তপন সিকদার এবং ভারতীয় জনতা পার্টি ও তৃণমূল কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যক কর্মী নিয়ে বাহাদুর শাহ জাফরের প্রপৌত্রের পত্নীর আবাসে উপস্থিত হন, তাঁদের সঙ্গে ছিলেন তথাগত রায়, মুজাফ্ফার খান এবং বিক্রম সরকার।

সুলতানা বেগম বলেন, 'আমাদের এখানে যে ওনারা এসেছেন তার জন্য আমি এই সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ।' তাঁর প্রতি এই হঠাৎ অপ্রত্যাশিত দৃষ্টিপাত করার জন্য তিনি যেন খানিকটা বিহ্বল। তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার একটি চেক এবং তাঁর নামে সরকার একটা ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট খুলবে যাতে ভবিষ্যতে সাহায্য করা যায়। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ তাঁর

মলিন বাসকক্ষটি নিজেদের চোখে দেখলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন যে পরিমাণ অর্থ সাহায্য তাঁকে করা হল তা তাঁর পুনর্বাসনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। প্রত্যেকেই কথা দিয়েছেন ভবিষ্যতে আরও অতিরিক্ত দেবেন।

এখন তিনি প্রতিমাস ৪০০.০০ টাকা হারে পেনশন পান, তিনি অনুরোধ করেছেন যাতে তাঁর পেনশনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয় এবং তাঁকে যেন ২ বিঘা জমি দেওয়া হয়।

নোংরা বার্ড কলোনিতে মন্ত্রীদ্বয় ও অন্যান্যরা উপস্থিত হওয়ায় দীর্ঘদিনের উপেক্ষিতা প্রয়াত শাহ্জাদা মির্জা বেদার বখ্তের বিধবা পত্নী যেন রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন। এলাকার লোকজন 'মোগল খানদান বহু' তাদের সাথে থাকায় বেশ গর্বিত। প্রায় ১,০০০ লোক উপস্থিত হওয়ার দীর্ঘক্ষণ প্রায় ১ ঘণ্টা ব্যস্ত ফোরশোর রোডে যান জট তৈরি হয়।

সুলতানা বেগম ভাবছেন এবার বুঝি ভাগ্যদেবী তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন, অর্থের কারণে তিনি সুন্দরী কন্যা তারান্না বখ্তের বিবাহ দিতে পারেন নি। এবার বুঝি সেই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।

৪.৭. ওয়াক্ফ বোর্ড, তাজমহল এবং সুলতানা বেগম।

২০০৫ সালের মাঝামাঝি উত্তর প্রদেশের সুন্নি ওয়াক্ফ বোর্ড ঐতিহাসিক তাজমহলকে তাদের সম্পত্তি হিসাবে দাবি করেছিল। ১৯৯৫ সালের ওয়াকফ্ আইন অনুযায়ী তাজমহলকে তারা 'ওয়াক্ফ সম্পত্তি' ঘোষণা করায় দেশজুড়ে তীব্র আলোড়ন ও প্রতিবাদ ওঠে। ওয়াক্ফ পর্ষদ যুক্তি দেখিয়েছিল সম্রাট শাহ্জাহান নাকি একাধিকবার বলে গিয়েছিলেন তাজমহল যেন ওয়াক্ফের অধীনে থাকে।

সুন্নি ওয়াক্ফ বোর্ডের ওই ঘোষণা সুলতানা বেগমের কানেও এসেছিল, তিনি সুন্নি ওয়াক্ফ বোর্ডের ঘোষণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকার তথা পুরাতাত্ত্বিক বিভাগ তাজমহলের রক্ষণাবেক্ষণ করছে তা সঠিক।

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী এইচ. আর. ভরদ্বাজ স্পষ্ট জানিয়েছিলেন তাজমহল জাতীয় সম্পদ, তার উপর কারও অধিকার থাকতে পারে না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্যকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন সুলতানা বেগম। তাঁর মতে কখনওই ওয়াক্ফ বোর্ডের হাতে তাজমহলকে তুলে দেওয়া ঠিক নয়। সুলতানা বেগমের ভাবনা অনুযায়ী ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তাজমহলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সরকারই উপযুক্তভাবে প্রতিপালনে সক্ষম [সূত্র : সংবাদ প্রতিদিন সংবাদপত্র, তারিখ ১৯/৭/২০০৫, কলিকাতা সংস্করণ]।

৪.৮ মুম্বাই দর্পণে সুলতানা বেগম ।

২০০৫ সালের ১১ ডিসেম্বর রবিবার 'মুম্বাই মিরর' পত্রিকায় সুলতানা বেগমের সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় তা বাংলা গড়িয়ে পৌঁছয় আরব সাগরের তীরে। সাংবাদিক রাখি চক্রবর্তী সুলতানা বেগমের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর অবস্থা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। সুলতানা বেগম মুম্বাই মিররের সাংবাদিককে জানান, 'তিনি সোনিয়া গান্ধীকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার মোগল স্থাপত্য থেকে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা অর্থ উপার্জন করে, কিন্তু এই স্থাপত্যের প্রকৃত মালিক মোগলদের বংশধরগণ, তাঁরা ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত এবং অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে।' সাংবাদিক চক্রবর্তী প্রশ্ন রেখেছিলেন 'কেউ কি শুনছেন?'

বেদার বখ্‌ত জীবিত থাকতে তিনি নিজে দিল্লি যাননি অথবা সুলতানা বেগমকেও যেতে দেননি, হয়তো শাহ্‌জাদার অভিমান ছিল গোটা দেশের উপর, থাকাটা অস্বাভাবিক ছিল না। 'মুম্বই মিরর' পত্রিকার সেই বিখ্যাত প্রতিবেদনটি তুলে ধরা হল পাঠকের অবগতির জন্য :

MUMBAI MIRROR

Mumbai, Sunday, December 11, 2005

Mughal Khandan Bahu languishees in a slum.

Sultana Begum, great grand daughter-in-law of Bahadur Shah Zafar, runs a tea stall to take out a living and gets a monthly pension of Rs. 400. After a letter to Sonia in May this year, she was promised that something would be done. Till date, nothing has happened.

Rakhi Chakaraborty.

Kolkata : A bahu of Sahai Khandaan now runs a tea stall in Howrah, about 10 km from Kolkata.

Meet Sultana Begum, great grand daughter-in-law of Bahadur Shah Zafar, the last Mughal emperor of India. Clad in a faded shalwar-kurta, her hair tied in a bun, she counts out the money a customer just paid for a cup of tea at her stall. Barely a stone's throw away, her rundown house in a dingy slum at Foreshore Road in Howrah reeks of povert. After the death of her husband Prince Mirza Bedar "Bukht, it's a struggle for existance for the mother of five daughter (four of them married) and a son. 'Apart

from the earnings from the tea stall, I get a monthly political pension of Rs. 400.' She said.

In a letter to Congress chief Sonia Gandhi, drafted by a lawyer, she has sought 'due compensation and provision for dignified existence'. A reply acknowldging the receipt of her letter, also said that it had been 'duly recommended to the concerned ministry for appropriate action.' That was in May.After that, nothing happened.

A distraught Sultana has not given up hope just yet. But, she wondered, 'What have I gained by remaining in India. After reading about her in newspapers, a descendant of Bahadur Shah Zafar, currently in Dubai, had come looking her in Kolkata. After much trouble, he located her. Saddended by her misery, he took away her son, who worked as 'cook, with him to Dubai. 'I could have gone away, too, for a better life' She lamented.

On August 15, 2003, the then Union minister of state for home affairs Swami Chinmayananda made a surprise visit to her shack. In February 2004, she received Rs. 50,000 from the ministry. Earlier, the West Bengal government had allotted her a flat but she was driven out by local goons. Then she landed in the howrah slum, her current address, with her children.

In her letter to Sonia, she wrote, 'Bedar Bukht was the descendant of Bahadur Shah Zafar and Zeenat Mahal. When the emperor was exiled in Rangoon in 1857, he was kept in confinement along with Zeenat Muhal and only surviving son Jawan Bukht. After the death of the emperor, Jawan Bukht married while still under house arrest. A son, Jamshed Bukht, was born to him. He later married Nadir Jahan, daughter of Piare Mian, a small-time hardware merchant of Lucknow. Their son, born in 1920, is Sultana's husband Bedar Bukht.'

It is told that Piare Mian smuggled in Bedar Bukht into India. And, young Bedar grew up in Kolkata with his Identity under wraps for fear of incurring the wrath of the British. It was only after independance that Bedar revealed his identity, said Sultana.[১]

'Being brought up under such hostile circumstances, Bedar

lived in the shadow of fear all his life. He was also suspicious of everybody. In fact, he never allowed me to visit Delhi while he was alive. Only after his death, I went and visited all the mausoleums and mununents built by the Mughals.' she said.

Bedar dealt in charms and talismans and earned his living as a soothsayer. 'But, taht was too meagre for survival,' she said.

In her plea to Sonia Gandhi, She wrote,'The Union government earns crores of rupees from such places (Mughal buildings) per year in entry fee from visitors. But, descendants of actual owners of these properties are deprived of compensation and are left to starve.' Is anybody listening?

টীকা :

(১) 'মুম্বই মিরর' পত্রিকার সাংবাদিককে সুলতানা বেগম জানিয়েছেন যে রেঙ্গুন থেকে শিশু বেদার বখ্‌তকে তার মাতামহ লুকিয়ে নিয়ে এসেছিলেন এবং পরাধীন হিন্দুস্থানে তাকে লুকিয়ে থাকতে হত এবং স্বাধীনতার পর তিনি আত্মপ্রকাশ করে।

আরও অনেক জায়গাতেই সুলতানা বেগম এই কথা বলেন। ১০।১।২০১৬ তারিখে আমি যখন তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার নিই, তিনি জানান, 'মাতামহ প্যায়ারে মির্জা শাহ্‌জাদা মির্জা বেদার বখ্‌তকে ফুলের ঝুড়িতে করে লুকিয়ে নিয়ে এসেছিলেন।'

বেদার বখ্‌তের স্মৃতি কথাতে কোথাও এরকম তথ্য নেই, তাঁর বর্ণনায় আছে তাঁকে কলকাতা হয়ে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। স্থলপথে রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় আসতে সময় লাগত অনেক, আজকের দিনেও স্থলপথে রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় আসা যথেষ্ট সমস্যার, এখন থেকে প্রায় এতশত বছর আগে সে পথ ছিল আরও দুর্গম, চোর ডাকাতের ভয় ছিল পদে পদে। বরং জলপথে কয়েকদিনের মধ্যে রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় আসা যেত। যদি জাহাজের মধ্যে ফুলের ঝুড়িতে করে শিশু বেদারকে আনতেন তাহলে কয়েকশত লোকের চোখে পড়াই ছিল স্বাভাবিক ঘটনা, ছোট্ট শিশুর খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো অত লোকের আড়ালে কি সম্ভব ছিল? সর্বোপরি ছিল ইংরেজ পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি। ইংরেজ সরকার মাসিক পেনশন অনুমোদন করেছিল বেদার বখ্‌তের জন্য, শর্ত ছিল ২০ (কুড়ি) বছর পর্যন্ত তিনি ওই ভাতা পাবেন, এরকম শর্ত ছিল না যে শিশু বেদার হিন্দুস্থানে ফিরতে পারবে না। যদি থাকত মির্জা বেদার বখ্‌তের পরবর্তীকালে লেখা

স্মৃতিকথা, অথবা 'রেঙ্গুন ডেইল নিউজ' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে রকম কোনও শর্তের উল্লেখ নেই।

শিশু মির্জা বেদার বখ্‌ত দিল্লিতে কয়েক বছর ছিল, ছিল হাকিম আজমল খানের বাড়ি, তাকে নিয়ে দিল্লির সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে দিনের পর দিন বিতর্ক হয়েছে, দিল্লির পর ভাগলপুরে ছিল। নিজাম সরকার তাকে ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে ভাতা নিয়মিত প্রতি মাসে মাসে পাঠাত, কোনও সময় ডাকঘর মারফত পাঠানো হত নির্দিষ্ট ঠিকানায়, সে সব তখনকার ইংরেজ গুপ্তচরেরা জানত না? তা ছাড়া ইংরেজ সরকার প্রদত্ত ভাতা তো সে পাচ্ছিলই, পাচ্ছিল বলেই সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে তা বৃদ্ধির জন্য বিতর্ক হয়। সুতরাং ইংরেজ শাসিত হিন্দুস্থানে যে মির্জা বেদার বখ্‌তকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল তা নয়, বরং ইংরেজ গুপ্তচরেরা তাঁর উপর কড়া নজর রেখেছিল, সেটা বেদার বখতের স্মৃতি কথা থেকেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আসলে পুনরায় যাতে মোগল শাহ্‌জাদাকে মধ্যমণি করে আর এক জনজাগরণ না হয় সেদিকে সরকারের নজর ছিল। তাছাড়া ১৮৫৭ সালের ইংরেজ প্রশাসনের সাথে ১৯২৪-৪৭ সালের প্রশাসনের মধ্যে পার্থক্যটা ছিল আশমান-জমিন, ততদিনে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছিল, আধুনিক প্রযুক্তির টেলিফোন ছিল, ছিল পুলিশ ব্যবস্থা। সুতরাং সুলতানা বেগমের ওই ধারণার মধ্যে আছে বিশ্বাস, আবেগ, নেই যুক্তি ও প্রামাণ্য তথ্য। তাঁর ধারণা এবং বেদার বখ্‌ত যেভাবে জীবন কাটিয়েছেন, এই দুটো বিষয় মেলানো যায় না। ইংরেজরা ওই সময়ে বাংলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে বিপ্লবীদের কড়া হাতে দমন করছিল, আত্মগোপন করা বিপ্লবীদের ধরছিল, সেখানে মির্জা বেদার বখ্‌তের মতো নাবালক ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা এবং গ্রেপ্তার করা কি খুব শক্ত কাজ ছিল? বেদার বখ্‌ত যে রেঙ্গুনে ছিল না ইংরেজরা নিশ্চয়ই তা জানত এবং যদি সে 'মোষ্ট ওয়ান্টেট' ব্যক্তিদের তালিকায় থাকত, ইংরেজদের পক্ষে তাঁকে খুঁজে পাওয়া কোনও বিরাট সমস্যা ছিল না। এমনও হতে পারে ঝুড়িতে ফুলের উপর শুইয়ে তাকে আনা হয়েছিল, লুকিয়ে নয়।

৪.৯. কালবৈশাখি ঝড়।

বাংলা দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান ২০০৬ সালের ৩০ এপ্রিল সুলতানা বেগমকে নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ প্রতিবেদন ছাপে। শিরোনামটি ছিল নিম্নরূপ :

'হাওড়ায় দুষ্কৃতীর হাতে অপমানিত হলেন বাহাদুর শা'র বংশধর।'

কী ঘটেছিল এই সময়? ২০০৬ সালের ২৫ এপ্রিল কালবৈশাখি ঝড়ে সুলতানা বেগমের ২০০৩ সালে তৈরি চায়ের দোকানটি ভেঙে যায়। তিনি দোকানটি পুনরায় তৈরি করতে গেলে বাধা দেয় স্থানীয় সমাজবিরোধী 'মুন্না'। কথাকাটাকাটি হতে হতে মুন্না বিশ্রী ভাষায় গালি দিতে থাকে। সুলতানা বেগম ঘটনাটি জানান স্থানীয় সিপিএম নেতা কৃষ্ণকিশোর রায়কে। তিনি বিষয়টির প্রতি কোনও গুরুত্ব না দিয়ে স্থানীয় থানায় যেতে পরামর্শ দেন। থানায় গেলে শিবপুর থানা সুলতানা বেগমের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে এবং নিজস্ব পরিচয়পত্র দেখাতে চাইলে কর্তব্যরত আধিকারিক বলেন, 'ওইসব কার্ড দেখিয়ে কোনও লাভ হবে না।'

পরে থানায় এ নিয়ে প্রশ্ন করলে যথারীতি তারা দুর্ব্যবহারের প্রসঙ্গটি অস্বীকার করে এবং পরে মুন্নাকে গ্রেপ্তার করা হয়। যে ঝড় উঠেছিল তা খুব বেশি দীর্ঘায়িত হয়নি ঠিকই, কিন্তু তিনি ওই চায়ের দোকন আর চালান নি।

৪.১০. কলকাতার কড়চা ও রাজদর্শন।

আনন্দবাজার পত্রিকায় একাধিকবার সুলতানা বেগমকে নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা ১৪১৩ সালের ১৫ মাঘ (২০০৭ সালের ২৯;৩০ জানুয়ারি) ৮৫ বর্ষ ৩১৯তম সংখ্যায় 'কলকাতার কড়চা' বিভাগে 'রাজদর্শন' শিরোনাম প্রকাশিত হওয়ার অন্য মাত্রা এনে দেয়। সিপাহি বিদ্রোহের দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষে সুলতানা বেগমকে সম্মান জানানো হয়েছিল। উৎসাহী পাঠক আপনিও রাজদর্শন করুন।

কলকাতার কড়চা

আনন্দবাজার পত্রিকা

৮৫ বর্ষ ৩১৯ সংখ্যা সোমবার ১৫ মাঘ ১৪১৩ কলকাতা

রাজদর্শন

সুলতানা

নাম সুলতানা বেগম। শেষ ভারত সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরের বংশের বধূ। বর্তমান নিবাস, হাওড়ার ১০৩/১২/সি, ফোরশোর রোডের বস্তি। স্বামী প্রয়াত মির্জা মহম্মদ বেদার বখ্‌ত ছিলেন বাহাদুর শাহের প্রপৌত্র। সিপাহি বিদ্রোহের সময়ে বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করে ব্রিটিশ। দিল্লির লাহোর গেটের কাছে সম্রাটের সন্তান ও পরিজনদের নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে তারা। চরম দুর্দশায় ১৮৬২-তে রেঙ্গুনেই মারা যান বাহাদুর শাহ। সম্রাটের পুত্রদের মধ্যে শিশু বলে একমাত্র বেঁচে যান জওয়ান বখ্‌ত। প্রাণের ভয়ে তাঁকেও আতমগোপন করে থাকতে হয়। এই জওয়ান বখ্‌তের ছেলে জামশেদ বখত এবং তাঁরই একমাত্র পুত্র ছিলেন সুলতানার স্বামী। ১৯২০-তে রেঙ্গুনে জন্মগ্রহণ করেন বেদার বখ্‌ত। আত্মগোপনেই ছিলেন স্বাধীনতার পর ভারতে আসেন। কপর্দকশূন্য এই রাজপুরুষের কোনও স্বীকৃতিই জোটেনি। হায়দরাবাদের নিজামের দেওয়া মাসিক পঞ্চাশ টাকা পেনশনই ছিল ভরসা। নানা জায়গা ঘুরে শেষে আসেন কলকাতায়। সেখানে তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয় সুলতানার এবং ওই অঞ্চলেই একটি ঘড় ভাড়া করে বাস করতে থাকেন রাজদম্পতি। পঁয়তাল্লিশ বছরের বেদার বখতের তেরো বছর বয়সি পত্নী সুলতানার অভাব কিন্তু সঙ্গ ছাড়েনি কোনও দিনও। অভাবের তাড়নায় বেদার বখ্‌ত যখন ফুটপাথে তাবিজ-মাদুলি বিক্রি করেছেন, সুলতানা তখন ঠোঙা তৈরি করছেন সংসার চালানোর জন্য। পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে ১৯৮০-তে মারা যান বেদার বখ্‌ত। তারপর রাজ্য সরকার থেকে সুলতানকে আনোয়ার শাহ রোডে একটি ফ্ল্যাট দেওয়া হলেও স্থানীয় গুণ্ডাদের অত্যাচারে সেখান থেকে পালাতে বাধ্য হন। আয় বলতে মাসিক চারশো টাকার সরকারি পেনশন। আর ছোট্ট একটা চায়ের দোকান। এতকাল কোনও স্বীকৃতিই পাননি। প্রজাতন্ত্র দিবসের সন্ধ্যায় হাওড়া পিলখানার কাছে কারবালার মাঠে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ ও আরও দুটি সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সিপাহি বিদ্রোহের দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষে সুলতানাকে সম্মান জানানো হল। রাজবংশের বধূর দুঃখ একটাই, এতদিন হয়ে গেল, এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কোনও স্বীকৃতি জানানো হল না।

৪.১১. আবাসন পাওয়ার জন্য পুনরায় উদ্যোগ গ্রহণ।

১৯৮১ যে সরকারি আবাসন তাঁকে দেওয়া হয়েছিল যা তিনি দুষ্কৃতি তাণ্ডবে ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন, নতুন করে যাতে আবার তাঁর জন্য সরকারি আবাসন মঞ্জুর করা হয় সে বিষয়ে তিনি ২০০৪ সালে আবার প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন।

২৬।২।২০০৪ তারিখে তিনি একটি আবেদন পত্র জমা দেন মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে এবং ৫৬৭ ক্রমাঙ্ক/সি. এম. এস.। তাং ৩১/৩/২০০৪ স্মারক পত্র দ্বারা প্রাপ্তি স্বীকার করেন প: ব: সরকারের পক্ষ থেকে। ১৩/৫/২০০৪ তারিখে তিনি পুনরায় আর একট আবেদন-অনুরোধ পত্র মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে দাখিল করেন, ওই পত্রের সাথে ৪।৭।১৯৮৬ তারিখে ১৬৪/পিএস/এম.এল.জি. স্মারক পত্রটিও যুক্ত করেন, যে ক্রমাঙ্ক দ্বারা তাঁর নামে একটি এক কামরার ফ্ল্যাট ওই সময় বরাদ্দ করা হয়েছিল।

দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর প: ব: সরকারের পক্ষ থেকে কোনও সদর্থক প্রত্যুত্তর আসেনি। এরপর ৮।৩।২০০৭ তারিখে সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ বিভাগের বিভাগীয় মন্ত্রী জনাব আবদুস সাত্তারের কাছে মহাকরণে জমা করেন। কিন্তু পরিস্থিতির সামান্যতম উন্নতি হয়নি।

৪.১২. সুড়ঙ্গের শেষে আশার আলো।

১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার মাসিক ৪০০ টাকা পেনশান বরাদ্দ করেছিল। ২০০৯ সালের সালের শেষে তাদের মনে হল ২০০৯ সালের বাজারদরের সাপেক্ষে ওই পরিমাণ অর্থ যথেষ্ট নয়। অবশ্য তারা যে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এ কথা ভাববার কোনও কারণ নেই। একের পর এক সকাতর আবেদনের প্রেক্ষিতে হাওড়া জেলার সহৃদয়া অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) সম্মাননীয়া শ্রীপ্রিয়া রঙ্গরাজন কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রবিভাগে একটি চিঠি পাঠান, স্মারক ক্রমাঙ্ক ৪৪৭/এস তাং ২১ অক্টোবর, ২০০৯ সাল। ওই চিঠির সূত্র ধরে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের খান মার্কেটস্থিত লোকনায়ক ভবন থেকে ২০০৯ সালের নভেম্বর মাসে পূর্বোক্ত অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে জবাবি চিঠি পাঠানো হয়। ওই চিঠিতে জানানো হয় মাননীয়া সুলতানা বেগমের রাজনৈতিক পেনশন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সুতরাং নতুনভাবে বরাদ্দ সংক্রান্ত চিঠি পাঠানোর জন্য কোষাগার অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক থেকে সুলতানা বেগমের পেনশন প্রদান সম্পর্কিত যাবতীয় পূর্ণ বিবরণ জানা প্রয়োজন। এছাড়া সুলতানা বেগমের কাছে চিঠি পাঠানোর

জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ ঠিকানা জানাও দরকার। যাতে ওই তথ্যগুলি অতি দ্রুত তাদের দপ্তরে পাঠানো যায় তার জন্য দ্রুততার সঙ্গে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। ভারত সরকারের পক্ষে অধস্তন সচিব এইচ. সি. ভানোট স্বাক্ষর করেছিলেন ওই চিঠিতে।

অধস্তন সচিব মি. ডানোট ২০১০ সালের নভেম্বর মাসে এক চিঠিতে Accounts Officer Pension Payment (Central), office of the accountant General (A & E), West Bengal, 2 No. Government place, Treasury Building, Kolkata-700 001 কে জানায় সুলতানা বেগমের পেনশান মাসিক ৪০০.০০ টাকা থেকে বেড়ে ৬,০০০ টাকা করা হয়েছে এবং তা দেওয়ার জন্য যেন উদ্যোগ নেয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকেও বিষয়টি অবগতি ও কার্যকর ভূমিকা নেওয়ার নির্দেশ দেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে [পরিশিষ্ট ১১ দ্রষ্টব্য]।

৪.১৩. সরকারি আবাসন পাওয়ার জন্য তৃতীয় প্রচেষ্টা।

ইতিমধ্যে ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে যায়। নতুন রাজ্য সরকারের নগরোন্নয়ন ও পৌরসভা সংক্রান্ত দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন জনাব ফিরহাদ হাকিম। এবার নতুন করে আশায় বুক বাঁধেন সুলতানা বেগম। স্থানীয় বিধায়ক তথা কৃষি বিপনন মন্ত্রী সম্মাননীয় শ্রী অরুপ রায়ের কাছে সুলতানা বেগম আবেদন করেন, একবার অন্তত তাঁর আবাস গৃহে তিনি আসুন এবং নিজের চোখে দেখুন কী অবস্থার মধ্যে তিনি বাস করছেন। পুরনো সমস্ত বিবরণ তিনি উল্লেখ করেছেন। জানালেন সরকার নির্ধারিত ওই ফ্ল্যাটে তিনি ১৯৮১ সালের জুলাই থেকে ১৯৮২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ছিলেন। যেহেতু তিনি বাধ্য হয়েছিলেন ওই আবাসন ছাড়তে স্বাভাবিকভাবে নির্ধারিত ভাড়া ও সার্ভিস চার্জ বাবদ ৫৫.০০ (পঞ্চান্ন) টাকা প্রতিমাসে জমা দিতেন না। ১৯৮৫ সালে তাঁকে বাকিদার (defaulter) ঘোষণা করা হয় কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের পক্ষ থেকে এবং তিনি ওই আবাসন সরকারের অনুকূলে সমর্পণ করেন।

২০০৪ সালে তদানীন্তন রাজ্যপাল মাননীয় গোপাল কৃষ্ণ গান্ধীর কাছে তিনি পূর্ণ বিবরণ জানিয়ে আবাসন পাওয়ার জন্য আবেদন পত্র জমা দেন এবং ৪ বছর বাদে ২০০৮ সালে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে তাঁকে ডেকে জানানো হয় যে তিনি আবসন পাওয়ার যোগ্য কিন্তু সংশ্লিষ্ট দপ্তরে (কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট)

কোনও আবাসন খালি না থাকায় তাঁকে দেওয়া যায়নি। সুলতানা বেগম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে ওই আবেদন পত্র জমা দিয়েছিলেন ২০১২ সালের ২৩ জুলাই।

ওই দিনই মাননীয় কৃষি বিপণন মন্ত্রী সুলতানা বেগমের আবেদন পত্রটি সদর্থক সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মন্ত্রী জনাব ফিরহাদ (ববি) হাকিমের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন (পরিশিষ্ট ১২ দ্রষ্টব্য)। তারপর ফোরশোর রোড দিয়ে কত গাড়ি গিয়েছে কেউ তার হিসাব রাখেনি, অনেকেই কথা দিয়েছিল যাতে একটু সম্মানজনক ভাবে থাকা যায় তার জন্য চেষ্টা করবেন। 'কেউই কথা রাখেনি'। ২০১৬ সালে পাট্টা পাওয়ার জন্য আবেদন করছিল উত্তর চব্বিশপরগণা জেলায় জেলা ভূমি সংস্কার দপ্তরে, অদ্ভুত যুক্তি দিয়ে সুলতানা বেগমের আবেদন পত্রটি Director, Land Records and Survay, Alipur স্থিত দপ্তরে পাঠিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন দায়িত্ব সেরেছেন, Alipur থেকে ওই আবেদন পত্রটি পাঠানো হয়েছে হাওড়া জেলা ভূমি সংস্কার বিভাগে। এখনও সমস্যার সমাধান হয়নি। এখনও নিরাশ্রয় রয়েছেন বাদশাহ আকবরের বংশের বধূ নিতান্ত অবহেলায় এক বস্তিতে।

এখন যেমন

৫.১. মোগল সম্রজ্ঞীর মুখোমুখি।

আইন-ই-আকবরি, হুমায়ুননামা, তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরি ও ঔরঙ্গজেবের ইতিহাস (স্যার যদুনাথ সরকার) প্রভৃতি গ্রন্থগুলি অনুবাদ; নুরজাহান বেগম, শাহ্‌জাদা মির্জা খসরুর জীবনী, মোগল হারেম প্রভৃতি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি লেখার পর ইচ্ছা হয়েছিল মোগলদের বংশধরগণ এখন কী অবস্থায় আছেন বা আদৌ আছেন কি না তা দেখা। প্রবল কৌতূহল ছিল মনের মধ্যে এখন তাঁরা কে কোন্ পেশায় রয়েছেন, তাদের সামাজিক অবস্থাটা কী রকম, তাঁরা তাদের পূর্বপুরুষদের কীভাবে মনে রেখেছেন ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছিল মনের মধ্যে। কোথায়ই বা তাঁরা আছেন?

এই সব ভাবতে ভাবতে আলোচনা প্রসঙ্গে বারাসতস্থিত ইতিহাস প্রিয় শ্রদ্ধেয় নিজাম উদ্দিন আহ্‌মদ আমায় একদিন হাওড়ায় ফেরশোর রাডের পাশে সুলতানা বেগমের চায়ের দোকানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। ইন্টারনেট বিশ্লেষণ করতে করতে পূর্বোক্ত পরবনত সিংহ মৈহারির মোবাইল ফোনের নম্বরটি পাই, ফোন করলে মাননীয় মৈহারিজি দুর্দান্তভাবে সাড়া দেন এবং আমায় আমন্ত্রণ জানান। ১০ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে সুলতানা বেগমের সঙ্গে প্রথমবার সাক্ষাৎ করতে যাই। হাওড়া স্টেশান থেকে ৫৫ নং বাসে উঠে (আরও একাধিক বাস, ফোরশোর রোড বরাবর যায়, অটো চলাচল করে) 'গাঙ্গেজ গার্ডেন' বাসস্টপে নামলাম। বার্ড কলোনি, শিবপুর, হাওড়া ৭১১ ১০২ খুঁজতে খুব অসুবিধা হল না। এরপর ১০৩/১২/সি পেলাম সহজেই কারণ পরবন্ত সিংহ মৈহারি 'সর্দার জি' নামে এখানে খুবই জনপ্রিয়। স্থানীয় একজনকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তিন ফুট চওড়া একটা গলিপথ দেখিয়ে বললেন, 'এই পথ দিয়ে চলে যান, একে বারে শেষ ঘরটিতে থাকেন সর্দারজি।'

আমি এগিয়ে চললাম, সেই তিন ফুট পথ দিয়ে, বিশ্বাস করুন, সত্যিই তিন ফুট, বা তার কমও হতে পারে। রাস্তার ডান দিকে উঁচু পাঁচিল, তার পাশেও তিন ফুট গলি (মূলত ৬ ফুট চওড়া রাস্তাটিকে সমান দুই ভাগে ভাগ করা

হয়েছে) আছে। রাস্তার বাম দিকে ৮ ফুট × ১০ ফুট মাপের ছোটো ছোটো অনেক ঘর, উপরে টালির চাল। তারমধ্যে শিশু, কিশোর ও প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকেরা বিভিন্ন কাজ করছেন। কলম তৈরি, কাপড়ে জরির কাজ, অলংকারের কাজ ইত্যাদি। একের পর এক ঘর পেরিয়ে চললাম। ঘরগুলির সামনে খোলা ড্রেন, প্রায় দুশো ফুট বা তার বেশি পেরিয়ে উপস্থিত হলাম শেষ মাথায়। এক বয়স্কা মহিলা কী যেন করছিলেন, বাসন পত্র পরিষ্কার করছিলেন সম্ভবত। তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম পরবন্ত সিংহ মৈহারি জির কথা। উনি আমায় বসতে বললেন একটা দড়ির খাটিয়ায়। একটু অপেক্ষা করতে বললেন। বসে বসে বৃদ্ধার কাজ দেখছিলাম। ওই দেওয়ালের গায়ে কাঠের আলমারি লাগানো হয়েছে, সেটা বাসনপত্র রাখা এবং তার উপরেই গ্যাস জ্বালিয়ে রান্না করার ব্যবস্থা। অর্থাৎ ওটাই রান্নাঘর। নাকে দুর্গন্ধ আসছিল, এগন্ধ অচেনা নয়, চোখ পড়ল ড্রেনের উপর, অর্ধ-কঠিন হলুদ পদার্থ ভেসে যাচ্ছিল, গন্ধ সেই সৌজন্যে। নাকে রুমাল দেওয়ার প্রয়োজন ছিল কিন্তু ভদ্রতা-বিরোধী বলে সম্ভব হচ্ছিল না। গা গুলিয়ে উঠছিল। একটু বাদেই এলেন দীর্ঘাকায় পাঞ্জাবি পরবন্ত সিংহ মৈহারি, আমি পরিচয় দিয়ে নমস্কার করলাম, উনি প্রতি নমস্কার জানালেন। উনি প্রাকৃতিক কাজ সারছিলেন এতক্ষণ, গন্ধের তীব্রতাটা এই জন্যই বোধ হয় একটু বেশিই ছিল।

আমায় জিজ্ঞাসা করলেন 'সুলতানা বেগমকে দেখেছেন?'

'না তো, কোথায় তিনি?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'এই তো সুলতানা বেগম।'

আমার সামনে এতেক্ষণ ধরে যিনি কাজ করছিলেন তাকে দেখালেন। আমি চমকে উঠলাম, তাকালাম বৃদ্ধার দিকে। নমস্কার জানালেন তিনিও সৌজন্য বজায় রাখলেন। বসলেন ওই দড়ির খাটিয়ায়। আমার মুখোমুখি। ষাটোর্ধ বয়েস, গায়ের রং ফর্সা, টিকালো নাক, টানা চোখ, মাথার চুল সব সাদা নয়, পরেছিলেন অতি নিম্নমানের সালোয়ার কামিজ এবং একটা সোয়েটার। বোঝা যায় এককালে বেশ সুন্দরী ছিলেন। শরীর মেদ বর্জিত। ইনিই প্রয়াত শাহজাদা মির্জা বেদার বখ্‌তের পত্নী সুলতানা বেগম।

অন্যদের কাছে এটি অতি সাধারণ ঘটনা বলে মনে হলেও আমি মনে মনে রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম। মহম বেগম, গুলরুখ বেগম (উভয়েই বাবরের পত্নী); হামিদা বানু বেগম (হুমায়ুনের পত্নী তথা আকবরের মা); মরিয়ম জমানি

(জাহাঙ্গিরের মা); মানবাঈ,মানমতি বাঈ, নুরজাহানবেগম (তিনজনই জাহাঙ্গিরের পত্নী); মুমতাজমহল (শাহজাহানের অন্যতম পত্নী) বা ঔরঙ্গাবাদি মহল (ঔরঙ্গজেবের অন্যতম পত্নী) প্রমুখ বাদশাহি বেগমদের অসংখ্য কাহিনি লিখতে লিখতে মোগল অন্দরমহল, তাদের পোশাক, খাদ্য, আচরণ সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা তৈরিই ছিল। যদি মোগল সাম্রাজ্যের পতন না ঘটত, যদি বেদার বখ্‌ত রাজধানীর মসনদে বসতেন অথবা যদি কোনও সুবার 'সুবাদার' হিসাবে দায়িত্ব পেতেন তাহলে সুলতানা বেগমের সঙ্গে পুর্বোক্ত মোগল সম্রাজ্ঞীগণের মর্যাদার দিক থেকে সামান্যতম পার্থক্য থাকত না। আপনি মানুন বা না মানুন সুলতানা বেগম বাস্তবিকই 'জীবিত মোগল সম্রাজ্ঞী।' একাধিক কেন্দ্রীয় সরকারের চিঠিতে মির্জা বেদার বখ্‌তকে 'শাহ্‌জাদা' (Prince) হিসাবেই সম্বোধন করা হয়েছে। ১৯৬৭ সালের ১৬ নভেম্বর চতুর্থ লোকসভা সচিবালয়ে থেকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে মির্জা মুহম্মদ বেদার বখ্‌ত-কে 'His Royal Highness Pricnce Mirza Muhamman Bedar Bukht of Calcutta' খেতাবে সম্বোধন করা হয়েছিল [পরিশিষ্ট ১০ দ্রষ্টব্য]। সুতরাং, সুলতানা বেগমের এ মর্যাদা প্রাপ্য।

তিনি দুর্দশার মধ্যে আছেন জানতাম, কিন্তু বাস্তব যে এত মারাত্মক ও ভয়ংকর তা প্রত্যক্ষ করলাম। ৮ ফুট × ১০ ফুট মাপের দুটো ঘর, ভাড়া নেওয়া আছে পরবন্‌ত সিংহের নামে, একটিতে থাকেন সর্দারজি, অপরটিতে অবিবাহিতা কন্যাকে নিয়ে থাকেন সুলতানা বেগম, মাঝে মাঝে একমাত্র পুত্র কামাল বখ্‌ত আসেন। তিনি বেশির ভাগ সময় থাকেন তাঁর দিদিমার বাড়ি, ছোটো বেলা থেকে ২৩ নং তালতলা বাজার স্ট্রিটে থেকেই সে বড়ো হয়েছে। মুম্বাইতে দিদি রৌণকজির কাছে বেড়াতে গিয়েছেন মধু ওরফে তারান্নুম বেগম। ঘরের মধ্যে আসবাব পত্র বলতে অতি সামান্য, ফাইবারের একটা কি দুটো চেয়ার একটা কাঠের ছোট্ট টেবিল, দেওয়ালে একটা ২ফুট × ৩ফুট মাপের তাকিয়া লাগানো, তাতে কিছু বই, ইট দিয়ে খানিকটা উঁচু করে গেঁথে কালো পাথর পাশাপাশি বসিয়ে শোয়ার খাট তৈরি করা হয়েছে, বাঁশের 'আড়া' থেকে বোলানো হয়েছে পাখা, প্রতিটি ঘরে একটা করে ছোটো ছোটো জানালা। দড়ির খাটিয়াতে বসেই আমাদের কথাবার্তা চলছিল। সকালের প্রাতরাশ তৈরি করেছিলেন পরবন্‌ত সিংহ মৈহারি জির জন্য পাউরুটির টোষ্ট আর চা। আমায় দিলেন চিনি ছাড়া দুধ চা এবং বিস্কুট। সর্বত্র দৈনতার চিহ্ন ফুটে উঠছে। শৌচাগারের দুর্গন্ধে বসে থাকাই আমার সমস্যা হচ্ছিল, ভাবছিলাম এর মধ্যে কী করে দিনের পর দিন থাকেন?

ইচ্ছা করেই কিছুক্ষণবাদে শৌচাগারে যাব বলায় ইতস্তত করতে লাগলেন দুজনেই, আমিও নাছোড়বান্দা। শিউড়ে উঠলাম তার অবস্থা দেখে, কী করে আছেন এরা এর মধ্যে? জিজ্ঞাসা করায় জানলাম ওরকম আরও একটি শৌচাগার আছে, দুটি শৌচাগার ব্যবহার করে শতাধিক ব্যক্তি, ওই বস্তির অসংখ্য লোক।

একদিন নদীতে স্নান করতে গেলে সম্রাট জাহাঙ্গির-পত্নী নুরজাহান বেগম ব্যয় করতেন ১,০০,০০০ (এক লাখ) টাকা (১ তোলা সোনার মূল্য ছিল ১০ থেকে ১২ টাকা), সেই মোগল বংশের আর এক বেগম একশত জনের সঙ্গে ব্যবহার করছেন শৌচাগার। প্রতিদিন গোলাপ জল, সুগন্ধি আতর দিয়ে একাধিকবার ধোয়া হত স্নানের জয়গাসহ শৌচাগার, সেখান বার্ডকলোনির এই শৌচাগারটি শেষ কবে অ্যাসিড বা অন্যান্য রাসায়নিক দিয়ে পরিস্কার করা হয়েছিল সম্ভবত ব্যবহাকারীরা মনে করতে পারেন না। তার মধ্যেই বেঁচে থাকা। বেঁচে না থেকে উপায় কী?

সংবাদ পত্রে প্রতিবেদন পড়ে সাংবাদিক দম্পতি নীনা ঝা এবং শিবনাথ ঝা একবার সুলতানা বেগমের কাছে সাক্ষাৎকার নিতে আসেন ২০০৮ সালে। তখন সুলতানা বেগমের চায়ের দোকান ছিল। 'সাহারা ইন্ডিয়া' পরিবারের আর্থিক সহায়তায় 'Prime Ministers of India' শিরোনামে অতিমূল্যবান একটি বই প্রকাশ করে ২০১০ সালে গাজিয়াবাদের Bismillah প্রকাশনা। সাংবাদিক দম্পতি কথা দিয়েছিলেন ওই বই বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ সুলতানা বেগমকে দেওয়া হবে। ল্যামিনেট করা আর্টপেপারে ছাপা ওই বইতে আছে পাতায় পাতায় রঙিন ছবি, নেহরু থেকে ড. মনোমোহন সিংহ পর্যন্ত প্রধান মন্ত্রীদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। অসাধারণ বইটির মূল্য ৮০০০.০০ (আট হাজার) টাকা। বইটির শুরুতেই রয়েছে চা বিক্রেতারত সুলতানা বেগমের ছবি। মুখবন্ধে লেখা রয়েছে ওই বই থেকে প্রাপ্ত অর্ধ বেগমকে দেওয়া হবে, মাত্র কয়েকটি সৌজন্যমূলক বই দেওয়া ছাড়া সাংবাদিক দম্পতি কোনও টাকা দেননি। কিন্তু প্রথম দুই পাতা জুড়ে ব্যবহার করা হয়েছে চা বিক্রিরত সুলতানা বেগমের ছবি।

সুলতানা বেগম জানালেন যে স্বামী মির্জা বেদার বখ্‌ত মারা যাওয়ার কিছুদিন পরই তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকার এককালীন ১০০০ টাকার (১৯৮০ সালে) অনুদান দিয়েছিল এবং প্রতিমাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাতা দেবেন বলে কথা দিয়েছিল। তারা সে কথা রাখেননি। সেই দুঃসময়ের কথা বলতে বলতে তিনি বেদনায় ভেঙে পড়ছিলেন, ৪০.০০ টাকা ভাড়া ও বেশ কয়েক মাস বাকি

পড়েগিয়েছিল, সামান্য যেটুকু জিনিস ছিল তা ঘর থেকে বার করে দেয় ঘরের মালিক। এতটুকু মানবিকতা সহানুভূতি দেখান নি।

জানতে চাইলাম তিনি কখনও দিল্লিতে মোগলদের স্থাপত্য গুলি দেখতে গিয়েছিলেন কি না। তিনি যা শোনালেন তা ছিল আর এক হৃদয় বিদারক কাহিনি।

হুমায়ুনের সমাধি সৌধে প্রবেশ করার টিকিট কাটতে গিয়ে দেখেন ব্যাগে যে টাকা পড়ে আছে টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকলে হোটেলে ফিরবেন কী করে? সুতরাং দূর থেকে দেখেই ফিরে আসেন।

পরে ২০০৪ সালে আবার গিয়েছিলেন দিল্লিতে। সেবার ওই হুমায়ুনের সমাধিসৌধে আর একটি ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। যেভাবে এক যুবক-যুবতীকে তিনি দেখেন ভালো লাগেনি। সমাধি সৌধে কেন ওরকম অসভ্য আচরণ করবে' লোকে? তাদের তো বোঝা উচিত তারা কোথায় আছে।

সেখানে অন্যায় দেখেই প্রতিবাদ করেছেন সঙ্গে সঙ্গে। ২০১০ সালে ৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানে গিয়েও গর্জে উঠেছিল তাঁর প্রতিবাদী মুখ। 'সমঝোতা এক্সপ্রেস' চেপে তিনি পাকিস্থানে যান। বললেন সেখানবার অভিজ্ঞতা :

'লাহৌরে নামতেই সাংবাদিকরা ঘিরে ধরেন। ইমরান খানসহ পাকিস্থানের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন। এক সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি শিয়া'?

আমি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম, 'আপনি এ কীরকম প্রশ্ন করছেন? প্রথমেই জানতে চাইছেন আমার ধর্ম কী? আপনি যদি কখনও হিন্দুস্থানে যান আপনাকে এধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়? আমার এই জবাবের পরে কি আপনি পরের প্রশ্ন করবেন?

'নুরজাহান বেগমের সমাধি সৌধ দেখে কান্না পেয়েছিল আমার, এতটুকু যত্ন নেয়নি ওরা, পলেস্তারা খসেখসে পড়ছে। বিদায় নেওয়ার আগে আমি পাকিস্থানের সাংবাদিকদের বলেছিলাম, 'যান, আমাদের হিন্দুস্থানে ঘুরে আসুন, দেখুন আর এক শিয়া সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের সমাধি সৌধ আমরা কীভাবে রেখেছি। নুরজাহান বেগম শিয়া, তাই কি এত অযত্ন, এত অবহেলা? আমি এমন এক শাহ্জাদার পত্নী যার ছিল না সাম্রাজ্য বা সম্পদ, তার জন্যই কি তাঁর পত্নীকে একটা সালোয়ার কামিজও দেওয়ার কথাও আপনাদের মনে হয়নি?'

উপস্থিত ব্যক্তিরা মাথা নামিয়ে ছিলেন। আর, ইচ্ছা নেই ওদেশে যাওয়ার, এদেশ এ হিন্দুস্থান অনেক গুন ভালো।'

আর একটা ঘটনা বললেন :

'কলকাতার থিয়েটার রোডে এক হোটেলের মালিক আমার কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, প্রতিদিন সকালে তাদের হোটেলে আমায় যেতে হবে, রান্নাঘরে কিছু নির্দেশ দিতে হবে, খানিকটা সময় হোটেলে, কাটিয়ে চলে আসতে হবে। ভালো টাকা দিতে চেয়েছিলেন, রাজি হইনি।'

প্রশ্ন করলাম, 'রাজি হন নি কেন?'

'ঠুনকো মর্যাদাবোধ। আমি মোগল বংশের বউ, আমি কি না করব এই কাজ? ছেলেকেও বলেছিল রান্না করার জন্য, আমার সঙ্গে সঙ্গে সেও রাজি হল না। তখন রাজি হলে সত্যিই বলছি এ দুর্দশায় থাকতে হত না। ওরা বাড়ি থেকে আসা যাওয়ার জন্য গাড়ি দিতে চেয়েছিল, ফ্ল্যাট দিতে চেয়েছিল। এখন মনে মনে আপসোস করি।'

ওই প্রস্তাব এসেছিল ১৯৮০-৮৪ সাল নাগাদ, আত্মমর্যাদা বোধ বাধা দিয়েছিল সুলতানা বেগমের। অথচ তখন টাকার খুবই দরকার ছিল। কিন্তু ওই আত্মসম্মান বোধই সেদিন ওই কাজে সম্মতি দেয়নি।

এরপর একাধিকবার বেগমের সঙ্গে কথা হয়েছে, আমায় চা খাইয়েছেন, 'নাস্তা' খাওয়ানোর জন্য পীড়াপিড়ি করেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আন্তরিকতার এতটুকু ঘাটতি ছিল না। বার্ড কলোনিতে ভাড়া ঘরের সামনে বসে শোনালেন অনেক কথা, অনেক মর্মবেদনার কাহিনি। বাহাদুর শাহ্ জাফরের কথা উঠতেই গর্বে বুক ভরে ওঠে তার।

মির্জা গালিব প্রসঙ্গে বললেন, 'মির্জা গালিব গদ্দার। আমি অবাকই হলাম তার ওই মন্তব্যে। সুলতানা বেগম তথ্য দিয়ে একটা একটা করে বোঝালেন :

"কয়েকজন ইংরেজ নারী, পুরুষ ও শিশুদের বিদ্রোহী সিপাহিরা প্রথমে বন্দি করে। তাদের হত্যার চেষ্টা করলে, দু দুবার বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরের চেষ্টায় তাঁরা রক্ষা পান, শেষে বাহাদুর শাহ্ জাফরের অজ্ঞাতসারে, তাঁদের হত্যা করা হয়। নিঃসন্দেহে ওই ঘটনা ছিল নিন্দার যোগ্য। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য বাদশাহও দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তখন তিনি অসহায় ছিলেন। মির্জা গালিবও ভর্ৎসনা করেন সিপাহিদের। কিন্তু বিদ্রোহ দমনের পর ইংরেজরা যখন হাজার হাজার নির্দোষ দিল্লিবাসী, মোগল বংশধরদের নির্মমভাবে হত্যা করল, মির্জা গালিব তখন অন্ধ, বোবা ও কালা। নিজের পেনশন কীভাবে বাড়বে সেই চিন্তায় তিনি ব্যস্ত ছিলেন, ইংল্যাণ্ডে রাণির প্রশংসা করে 'কসিদা' লিখে পাঠালেন। গদ্দার নয়?"

তিনি ক্ষোভ উগরে দিলেন :

সিপাহি বিদ্রোহকে বলা হয় হিন্দুস্থানের প্রথম স্বাধীনতার সংঘর্ষ, দিল্লির লাল কেল্লা থেকে প্রতিবছর প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা দেন। বাহাদুরশাহ জাফরের নাম কতবার বলেন তাঁরা? কটা মূর্তি তৈরি হয়েছে তাঁর? তাঁর নামে কি তৈরি হয়েছে কোনও স্টেডিয়াম, বিশ্ববিদ্যালয়? কোনও সংগ্রহশালা তৈরি করা যেত না তাঁর জন্য? তাঁর দেহাংশ কি আনা যেত না এই হিন্দুস্থানে? তাঁর কি কোনও অবদান নেই স্বাধীনতার জন্য?

এখনও তিনি আশাবাদী হিন্দুস্থানকে নিয়ে তাঁর বিশ্বাস আছে হিন্দুস্থান একদিন তাঁর পূর্ব পুরুষদের সঠিক মর্যাদা দেবে?

৫.২. ক্রান্তিদিবস।

মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের সময় সুলতানা বেগমই জানিয়েছেন ২০১৫ সাল থেকে ঔরঙ্গবাদে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ১১ মে তারিখে 'ক্রান্তিদিবস' পালন। ১৮৫৭ সালের ১১ মে সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হয়। সুলতানা বেগমকে আয়োজক সংস্থা আমন্ত্রণ জানিয়েছিল এবং তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন।

ওই অনুষ্ঠানের আয়োজকদের অন্যতম খালেক পেইন্টার (০৯০২৮০২৪০৭১) সুলতানা বেগম সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিচিত। তিনি ঔরঙ্গাবাদেই থাকেন। গতবছর আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে সুলতানা বেগমকে সম্বর্ধনা এবং কিছু অর্থ সাহায্য করা হয়েছিল। এটাই আশার কথা হিন্দুস্থানের সবাই তাদের ভুলে যায়নি।

৫.৩. মোগল বংশবৃক্ষে সুলতানা বেগমের অবস্থান

(১) বাহাদুর শাহ জাফর + বেগম জিনাত মহল।

↓

(২) মির্জা জওয়ান বখ্‌ত + নবাব শাহ জমানি বেগম

↓

(৩) মির্জা মুহম্মদ জামশেদ বখ্‌ত + নদর জাহান বেগম

↓

(৪) মির্জা বেদার বখ্‌ত + সুলতানা বেগম

দিল্লি খানদান

৬.১. মির্জা ফরখুন্দা জামাল।

প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে (১.৯) যে ১০ জুলাই, ১৮৫৬ রহস্যজনকভাবে সিংহাসনের অন্যতম দাবিদার বাহাদুর শাহ জাফরের অন্যতম জীবিত জ্যেষ্ঠপুত্র মির্জা ফতেউল মুল্‌ক বাহাদুর ওরফে মির্জা ফকরুর মৃত্যু হয়। যদি তাঁর অকাল মৃত্যু না ঘটত তা হলে হয়তো বাহাদুর শাহ জাফরের অবর্তমানে তিনি মসনদে বসতেন, কারণ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিকারিকগণ তাঁকে পছন্দ করতেন। তাঁর সঙ্গে বিবাহ হয় সেই সময়কার দিল্লির প্রভাবশালী ব্যক্তি মির্জা ইলাহি বক্‌সের ভাইঝির। সিপাহি বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে এই মির্জা ইলাহি বক্‌স বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা বিভিন্ন তথ্য ইংরেজদের সরবরাহ করতে থাকেন। যখন ইংরেজরা একের পর এক মোগল খানদানকে হত্যা করছিল, মির্জা ইলাহি বক্‌স সুকৌশলে তাঁর বিধবা ভাইঝিকে রক্ষা করেন। এরই গর্ভে মির্জা ফকরুর এক পুত্র জন্মায়, মির্জা ফরখুন্দা জামাল। শিশু ফরখুন্দা জামালকে ইংরেজরা যে হত্যা করবে না এ বিষয়ে মির্জা ইলাহি বক্‌স নিশ্চিন্ত ছিলেন না, সুতরাং তিনি ওই শিশুটিকে রক্ষার দায়িত্ব দিলেন জনৈক আন্না নামীয় সেবিকার উপর। সেবিকা আন্না বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করে ও বাসস্থান বদল করে শিশু জামালকে নিয়ে বাস করতে থাকে এবং মোগলবংশধরকে রক্ষা করে। প্রবল ঝুঁকি নিয়ে ওই সেবিকা শিশু ফরখুন্দা জামালকে নিয়ে রাজধানী দিল্লির বাইরে চলে এল এবং পাঁচ বছর এক প্রকার অজ্ঞাতবাসে চলে গেল শাহজাদাকে নিয়ে। এরপর পাঁচ বছর পর সম্ভবত বাহাদুর শাহ জাফরের জীবনাবসান ঘটলে ইংরেজরা (ততদিনে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে হিন্দুস্থান নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের ভার গিয়েছিল মহারানি ভিক্টোরিয়ার অধীনে।) ওই শিশু শাহজাদার নিরাপত্তার আশ্বাস দেয় এবং এই আশ্বাস পেয়ে পূর্বোক্ত সেবিকা অজ্ঞাতবাস থেকে ছোট্ট ফরখুন্দা জামাল কে নিয়ে (তখন তার বয়স সাত বা আট বছর মাত্র) দিল্লি প্রত্যাবর্তন করে। মির্জা জামালের স্থান হল মির্জা ইলাহি বক্‌সের গৃহে এবং সে সেখানেই বড়ো হতে লাগল। পরবর্তী সময়ে মির্জা ইলাহি বক্‌সের এক কন্যার সঙ্গে মির্জা ফরখুন্দা জামালের বিবাহ হয়।

ঐতিহাসিক মহেশ্বর দয়াল ও তারা চাঁদ তাঁদের গ্রন্থে উভয়ই লেখেন :

'Mirza Fatehul Mulk Bahadur alias Mirza Fakhruh was appointed the heir aparrent in 1953. At the time of mutiny, the son of Mirza Fakhruh, Mirza Farkhunda Jamal was only four or five years old. When Major Hudson killed the sons and grandsons of Bahadur Shah Zafar at Khooni Darwaza, Delhi on Bahadur Shah Zafar Marg, and soon after this news broke out, the nurse Anna—of Mirza Farkhunda Jamal took the child secretly without even informing the family because those who were responsible for the mutiny were among the family only. For years, she did not reveal his identity and nurtured him by doing different work at different places. That is how she managed to save the last successor.'

৬.২. ফরখুন্দা জামালের পুত্র।

পূর্বোক্ত শাহজাদা মির্জা ফরখুনদা জামালের এক পুত্র জন্মায় [নামটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।] তাঁর সঙ্গে বিবাহ হয় কমর সুলতান বেগমের। তৎকালীন ইংরেজ প্রশাসন ফরখুন্দা জামালের পুত্রকে দরিয়াগঞ্জ ও কুচা চেলান (Kucha chelan) অঞ্চলের জামা মসজিদের নিকটবর্তী এলাকায় 'পান্চ' (Panch) হিসাবে নিয়োগ করে, তিনি দিল্লির অধিবাসীদের নিজের প্রজা মনে করতেন। দিল্লিবাসীও সময়ে অসময়ে, বিভিন্ন উৎসবে তাঁর কাছে আসত, তাঁকে আমন্ত্রণ জানাত। বিভিন্ন মোগল পূর্বপুরুষদেরই মতো তিনি একজন দক্ষ শিকারি ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি হরিণ শিকারে যেতেন এবং হরিণ শিকারের পর তা গরিব লোকজনদের হাতে তুলে দিতেন। বর্ষাকালে কুতুব মিনারের কাছে কুতুব শাহির কাছে চলে যেতেন এবং ঘরভাড়া করে সপরিবারে সময় কাটাতেন; আনন্দ হৈ হুল্লোড়ে মেতে উঠতেন। সারারাত ধরে চলত সেই অনুষ্ঠান।

ইংরেজরা তাঁকে অবসরকালীন ভাতা মঞ্জুর করেছিল এবং তাঁর মৃত্যুর পর ওই ভাতা পেতে থাকেন তাঁর পত্নী কমর সুলতান বেগম। কমর সুলতান বেগমের মৃত্যু হলে ওই ভাতা প্রদান বন্ধ হয়ে যায়।

৬.৩. পাকিজা সুলতান বেগম।

কমর সুলতান বেগমের কন্যা (ফরখুন্দা জামালের পুত্রের ঔরসজাত) পাকিজা সুলতান বেগম। শৈশবেই পাকিজা তাঁর পিতাকে হারায়। পুরনো দিল্লিতে বড়

হতে থাকে পাকিজা। ১৩ নভেম্বর, ১৯৩৭ পাকিজা জন্মগ্রহণ করেন, পুরনো দিল্লিতে স্কুলের পড়া শেষ করে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হন। স্বাধীনতার পরে তাঁর মনে হয়েছিল উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তাঁর পক্ষে দিল্লি থাকা যথেষ্ট নিরাপদ নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে তিনি আবার দিল্লিতে ফিরে আসেন, ততদিনে স্বাধীন ভারতবর্ষের পরিস্থিতি অনেক বদল ঘটে গিয়েছিল, যদিও পাকিজা সুলতান বেগমের আশঙ্কা নিতান্তই অনুমান ভিত্তিক ছিল। এরপর মায়ের উৎসাহ ও প্রেরণায় তিনি 'লেডি শ্রীরাম কলেজ'-এ অধ্যাপনার চাকুরি গ্রহণ করেন, কিন্তু এই পেশা তাঁর মনের মতো ছিল না, শিক্ষকতা করতে ভালোও লাগত না পাকিজা সুলতান বেগমের, স্বাভাবিকভাবে বেশ কিছুদিন ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওই কলেজে অধ্যাপনা করলেও শেষে ওই চাকুরি পরিত্যাগ করেন। এরপর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশান দপ্তরে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এই দপ্তরটি ছিল ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রকের অধীনে। পরে ওই মন্ত্রকের অধীন আফ্রিকা সংক্রান্ত বিভাগের (Africa desk) দায়িত্ব পান এবং আরও পরে রাজধানীতে ফরেন কালচার সেন্টারে ডাইরেক্টর পদে উন্নীত হয়েছিলেন। ওই পদে থাকতেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

বিখ্যাত আইনজীবী ড্যানিয়েল লতিফির সঙ্গে পাকিজা সুলতান বেগমের বিবাহ হয়, ১৯৮০ সালে সাড়া জাগানো শাহ বানো মামলায় তাঁর স্বামী অংশগ্রহণ করেন। ড্যানিয়েল লতিফির আবাস ছিল দিল্লির নিতিবাগ (Neeti Bagh) অঞ্চলে। স্বামীর মৃত্যুর পর প্রয়াত স্বামীর মা অর্থাৎ পাকিজা বেগমের শাশুড়ি ওই বাড়ির অংশ দাবি করেন। তাঁর দাবির প্রতি মান্যতা দিয়ে ওই সম্পত্তি বিক্রি করে পাকিজা সুলতান বেগম নয়দাতে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে চলে যান। এক সাক্ষাৎকারে লেখক উইলিয়াম ডেলরেম্পল কে তিনি জানান : 'স্বামীর মৃত্যুর পর আমি এখানে (নয়দা-তে) চলে আসি। নিতিবাগ অঞ্চলে যে বাড়িতে আমরা থাকতাম আমার শাশুড়ি তার অংশ দাবি করেন। আমার অংশ বিক্রি করে এখানে চলে আসি।'

একটু বেশি বয়সে পাকিজা সুলতান বেগমের সঙ্গে ড্যানিয়েল লতিফির বিবাহ হয়। কেন বিলম্বে বিবাহ হয়েছিল সে ব্যাখ্যাও শুনিয়েছিলেন তিনি : 'আমার মা কুমর সুলতান বেগম পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী ছিলেন, আমাকেই তাঁকে সেবা করতে হত। এই কারণে আমার বিবাহ দেরিতে হয় এবং আমি কোনও সন্তান ধারণ করতে পারিনি।'

দিল্লি থেকে নয়দাতে আসায় তিনি আদৌ খুশি হননি। তাঁর ভাষায় : 'দিল্লি শহর সাজিয়েছিলেন আমার পূর্বপুরুষগণ, শুধু দিল্লি কেন তামাম ভারতবর্ষ তথা হিন্দুস্থান তাঁদের হাতে গড়ে ওঠে। দিল্লি ছেড়ে আসায় আমি অসুখী, এখানকার 'আবহাওয়া' আমার সহ্য হয় না। তাছাড়া আমার বন্ধুরা সবাই সেখানে রয়েছে। দিল্লিতে আমি জিমখানা ক্লাব, ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার-এর সদস্য ছিলাম, তাদের সঙ্গ ছাড়তে হয়েছে, আমি প্রতিটি মুহূর্তে সে সবের বিচ্ছেদ মর্মে মর্মে, অনুভব করি। সত্যি আমার কাছে এই পরিবেশ বিরক্তিকর।'

প্রকৃতপক্ষে নয়দাতে থাকেতে তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। পাকিজা বেগম ছিলেন শেষ মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরের প্র-প্র-পৌত্রী (great-great grand daughter)। স্বামী ড্যানিয়েল লতিফির মৃত্যু হয় ১৭ জুন, ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে। কলকাতা এবং হায়দরাবাদে যে মোগল কংশধরগণ বসবাস করতেন, পাকিজা বেগমের তা অজানা ছিল না। কলকাতায় (হাওড়া) বাসবাসকারী সুলতানা বেগম প্রকৃতপক্ষে মোগল বংশের পুত্র-বধূ, বাহাদুর শাহ জাফরের প্র-পৌত্রের পত্নী, কিন্তু পাকিজা সুলতান বেগম ছিলেন মোগল বংশের কন্যা, শাহজাদি।

বাহাদুর শাহ জাফর
↓
মির্জা ফকরু (পুত্র)
ওরফে মির্জাফতেউল-সুলথ
↓ ওয়ালি আহেমদ বাহাদুর
মির্জা ফরখুন্দা জামাল (পুত্র)
↓ হামিদশাহ (পুত্র)
বেগম কমর সুলতান (কন্যা)
↓
১। পাকিজা সুলতান বেগম (কন্যা)
২। বেগম তাহিরা সুলতান (কন্যা)

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পাকিজা সুলতান বেগম হৃদযন্ত্রের সমস্যায় ভোগেন এবং ২০।৯।২০১৪তারিখে ৭৭ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। ১৯৯৩ সালের জুন মাসে মারা যায় তাঁর মা কমর সুলতান বেগম।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তারিখ :

জন্ম : ১৩.১১.১৯৩৭

মায়ের মৃত্যু : জুন, ১৯৯৩

স্বামীর মৃত্যু : ১৭ জুন, ২০০০

পাকিজা সুলতান বেগমের মৃত্যু : ২০.৯.২০১৪

৬.৪. একমাত্র মোগল বংশধর ?

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা ও হাওড়া এবং বর্তমান তেলেঙ্গানা রাজ্যের হায়দরাবাদ শহরে মোগলদের একাধিক বংশধর বসবাস করেন, কিন্তু পাকিজা বেগম কখনও তা স্বীকার করেন নি, তাঁর মত ও বিশ্বাস অনুযায়ী তিনিই ছিলেন একমাত্র জীবিত মোগল পরিবারের সন্তান। যেমন, তিনি হায়দরাবাদের লায়লা উমাহানি বেগমকে মোগল পরিবারের সদস্যা হিসাবে মানতেন না। তাঁর মতে : 'তামাম দিল্লিবাসী জানে আমিই একমাত্র মোগল বংশের সন্তান। তাছাড়া মির্জা খোয়ায়েশ কখনও মসনদে অভিষিক্ত হওয়ার মতো অবস্থায় যান নি বরং তাঁর পিতামহ মির্জা ফকরুকে ইংরেজরা পরবর্তী বাদশাহ হিসাবে মেনে নিয়েছিল (যদি সিপাহি বিদ্রোহ না হত।)'। পাকিজা সুলতান বেগম স্বীকার করুন বা না করুন, হায়দরাবাদের টুসি পরিবার এবং কলকাতা-হাওড়ার মির্জা বেদার বখ্‌তের পরিবারের সদস্যগণও যে মোগল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আবার অনেকে বলেন পাকিজা সুলতান বেগমের পিতামহ মির্জা ফরখুন্দা জামালের একপুত্র ও কন্যা যথাক্রমে হামিদ শাহ এবং বেগম কমর সুলতান।

৬.৫. কমর সুলতান বেগম।

পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজরা প্রথমে ফরখুন্দা জামাল ও পরে কমর সুলতান বেগমের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বেগম কমর সুলতান ওই ভাতা নিতে অস্বীকার করেন, তাঁর মতে, স্বাধীন দেশে সবাই সমান মর্যদা পাওয়ার যোগ্য। কমর সুলতান বেগমের দুই কন্যা জন্মে, পাকিজা সুলতান বেগম ও বেগম তাহিরা সুলতান। জুন, ১৯৯৩, বেগম কমর সুলতানের (পাকিজা সুলতান বেগমের মা) মৃত্যু হয়। স্বাধীনদেশে সিপাহি বিদ্রোহের স্মরণে এক অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রাধামন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর উপস্থিতিতে বেগম কমর সুলতানকে এক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তাঁকে জক্‌তে (মসনদ)

বসানো হয়েছিল। পণ্ডিতজি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁর কোনও সমস্যা আছে কি না, কিন্তু তিনি সরকারের কাছে কোনও দাবি করেন নি।

৬.৬. বেগম তাহিরা সুলতান :

৬.৩ অংশে উল্লেখ করা হয়েছে বেগম কমর সুলতানের দুই কন্যা ছিল, যথাক্রমে পাকিজা সুলতান বেগম ও বেগম তাহিরা সুলতান। বেগম তাহিরা সুলতান লণ্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কোনও তথ্য পাওয়া যায় নি। [সহৃদয় পাঠক এ বিষয়ে কোনও সংবাদ পেলে জানালে কৃতজ্ঞ হবো এবং পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবো]।

হায়দরাবাদ খানদান

৭.১. মির্জা খোয়ায়েশ (কুয়াইশ), নেপাল থেকে ঔরাঙ্গবাদ।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে মির্জা খোয়ায়েশ ও মির্জা আবদুল্যা কে হুমায়ুনের সমাধিসৌধ থেকে বন্দি করা হয়েছিল এবং এক শিখ সৈন্যের বদান্যতায় তারা সেখান থেকে পালাতে সক্ষম হন। মির্জা খোয়ায়েশ তাঁর (শ্যালক অথবা ভগ্নিপতি, brother-in-law) নিকটাত্মীয়ের কাছে গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করে ব্যর্থ হন। এর পর পত্নী আশরাফ মহলকে নিয়ে নেপালে পালিয়ে যান এবং সস্ত্রীক সেখানে আত্মগোপন করেন। পরে গোপনে রাজপুতনার উদয়পুরে যান। উদয়পুরে মির্জা খোয়ায়েশ পরিচিত ছিলেন 'দরবিশ মিঞাসাহিব' হিসাবে, রাজমাতার অনুগ্রহে প্রতিদিন দুটাকা হিসাবে ভাতা মঞ্জুর করেন উদয়পুরের মহারাজা। মহারাজা ও রাজমাতাসহ মাত্র কয়েকজন মিঞাঁ সাহিবের প্রকৃত পরিচয় জানতেন। উদয়পুরেও মির্জা খোয়ায়েশ নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন নি, ইংরেজ গুপ্তচরেরা যে ভাবেই হোক তাঁর পরিচয় জানতে পেরেছিল এবং একাধিক বার উদয়পুরে হানা দেয়। কিন্তু প্রতিবারই আগেই সংবাদ আসায় মির্জা খোয়ায়েশ পালিয়ে যেতে সক্ষম হতেন।

উদয়পুরে অবস্থান যে নিরাপদ নয় সম্ভবত শাহজাদা খোয়ায়েশ বুঝতে পারছিলেন তিনি উদয়পুর পরিত্যাগ করেন, কিন্তু যেহেতু তাঁর উদয়পুর পরিত্যাগ ঘটেছিল অত্যন্ত গোপনে এই কারণে উদয়পুর পরিত্যাগের সঠিক তারিখ জানা যায় না। উদয়পুর থেকে দরবিশের বেশে তিনি দাক্ষিণাত্যের পথ ধরেন এবং অনেক প্রতিকূলতার পর ঔরঙ্গাবাদ উপস্থিত হন।

৭.২. ঔরঙ্গাবাদ থেকে নিজাম রাজ্যে।

ঔরঙ্গাবাদে ঠিক কত দিন ছিলেন বা কোথায় ছিলেন এ তথ্য অজানা। তবে সেখানেও যে তিনি নিশ্চিন্তে ছিলেন না, ঔরঙ্গাবাদ পরিত্যাগই তার বড় প্রমাণ। একসময় নিজাম-উল-মুল্‌ক ছিলেন মোগল প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, হায়দরাবাদকে রাজধানী করে নিজামের বংশধরগণ তখন স্বমহিমায় বিরাজ করছিলেন, তাঁদের কাছে আশ্রয় পাওয়ার আশায় তিনি ঔরঙ্গাবাদ ছাড়লেন এবং নিজাম-রাজ্যে প্রবেশ করেন।

৭.৩. হায়দরাবাদে মির্জা আবদুল্লা।

মির্জা খোয়ায়েশের একমাত্র পুত্র মির্জা আবদুল্লা। মির্জা আবদুল্লা সম্ভবত ১৮৯৫ সাল নাগাদ হায়দরাবাদে উপস্থিত হন। হায়দরাবাদে তিনি নিজাম প্রশাসনের কয়েকজন কর্মচারীর মাধ্যমে নিজামের দৃষ্টি আবর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মির্জা খোয়ায়েশ হায়দরাবাদে উপস্থিত হয়েছিলেন কিনা বলা শক্ত, যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন তাঁর মৃত্যু তারিখ। মির্জা আবদুল্লার অবস্থা জেনে নিজাম ব্যথিত হলেন, একসময় তাঁরা ছিলেন মোগলদের অধীনস্ত কর্মচারী, আর সেই মোগল বংশধর কিনা তাঁর আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থী? মির্জা আবদুল্লা আশ্রয়লাভ করলেন। এতদিন বাদে নিরাপদে থাকবার মতো জায়গা মিলল।

৭.৪. মির্জা গফ্ফর ওরফে মির্জা প্যায়ারে।

মির্জা আবদুল্লার পুত্র মির্জা গফ্ফর ওরফে মির্জা প্যায়ারে বা প্যায়রে মির্জা। প্যায়ারে মির্জার সঙ্গে বিবাহ হয় নিজাম ঘনিষ্ঠ খান বাহাদুর টিপুখানের কন্যা (অন্য সুত্রে নাতনি) হাবিবা বেগমের। ঠিক কোন সময়ে এই বিবাহ হয় তা সঠিক জানা যায় না। প্যায়ারে মির্জা ও হাবিবা বেগমের একপুত্র ও দুই কন্যা জন্মে, যথাক্রমে মির্জা ইউসুফ আলি বেগ, হুসান জহানয়ারা বেগম এবং লায়লা উম্মাহানি (উমাহানি) বেগম। অকৃতদার অবস্থায় মির্জা ইউসুফ আলি বেগ হায়দরাবাদে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

একটি সূত্র থেকে জানা যায় মির্জা প্যায়ারের সঙ্গে হাবিবা বেগমের (হাবিব বেগম) বিবাহ হয় ১৯০৬ সালে। নিজাম সরকারের অধীন আবগারি দপ্তরে চাকুরি লাভ করলেন মির্জা প্যায়ারে, অশ্যই তা টিপু খানের বদান্যতায়। স্বাভাবিকভাবে একই সঙ্গে পেলেন রাজত্ব ও রাজকন্যা! শুল্ক বিভাগে দারোগা পদের বেতন একেবারে কম ছিল না। পাশাপাশি প্যায়ারে মির্জা পেলেন শ্বশুর বাড়ির দিক থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ [বাহাদুর শাহ জাফরের শেষ দিনগুলি : বিপ্রদাশ বড়ুয়া, পৃ. ২৫]।

৭.৫. হুসান জহানয়ারা বেগম ও তাঁর সন্তানগণ।

মুহম্মদ মুনাবরের (Md. Munnawar) সঙ্গে হুসান জাহানয়ারা বেগমের বিবাহ হয়। জাহানয়ারা বেগমের তিনপুত্র ও চার কন্যা, তাঁদের নাম যথাক্রমে—

(১) মুহম্মদ বাবর

(২) মুহম্মদ আফসর

(৩) মুহম্মদ বাকার (বা বাখার)
(৪) আখতের ফতিমা
(৫) নাদের ফতিমা
(৬) মুস্তার ফতিমা এবং
(৭) নায়ার ফতিমা।

৭.৬. লায়লা উমাহানি বেগম ও তাঁর সন্তানগণ।

লায়লা উম্মাহানি (উমাহানি) বেগমের সঙ্গে বিবাহ হয় মৈনুদ্দিন টুসির। মৈনুদ্দিন টুসির পূর্বপুরুষ ছিলেন ইরানের সুলতান আহমেদ শাহের প্রধানমন্ত্রী।

আদরের বড়ো মেয়ে উমাহানি বেগমের সঙ্গে মির্জা প্যায়ারে বিবাহ স্থির করেন মৈনুদ্দিন টুসির। মৈনুদ্দিনন টুসি ছিলেন নিজাম সরকারের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বশীল কর্মচারী। তাঁরও ছিল উচ্চ বংশ মর্যাদা, এবং ওইটি ছাড়া ছিল সততা ও দায়িত্ববোধ। তাঁরা পূর্বপুরুষ পঞ্চদশ শতকে ছিলেন বাগদাদের সুলতান আহমেদ শাহের প্রশাসনে প্রধান মন্ত্রী। আর্থিক অবস্থা বলতে ভরসা ছিল নিজাম প্রশাসনের চাকুরি। তবে মৈনুদ্দিন টুসি ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত, তিনি আইন নিয়ে পড়াশুনো করেন। মির্জা প্যায়ারে মৈনুদ্দিনকে ঘরজামাই করে রাখেন। সেই সময় চারমিনারের কাছে রিকাভগঞ্জে ছিল প্যায়ারে মির্জার প্রাসাদ তুল্য বিশাল অট্টালিকা। স্বামীসহ উমাহানি বেগম সেখানেই থাকতেন। প্যায়ারে মির্জা ছিলেন সংগীতের সমঝদার এবং দক্ষ শিল্পীও বটে। সারেঙ্গি বাজাতেন, গানের গলাটি ছিল অসাধারণ, অনবদ্য! উমাহানি বেগম পিতার কাছে সংগীত শিখতেন, ঘোড়ায় চড়তে জানতেন এক কথায় বেশ সুখেই ছিলেন উমাহানি ও তাঁর স্বামী।

উমাহানি বেগমের প্রিয় ছিল বাহাদুর শাহ জাফরের একটি গজল. গাইতেন অপূর্ব!

'হোতে হোতে হো গ্যয়া,
মানহোস মুঝসে আয়না,
পহলে মুঝকো দেখতা থা,
অব তো ও ভি রোতা হ্যাঁয়...।'

অর্থাৎ, ভাঙা আয়নায় আমার প্রতিবিম্বের কপালও ভেঙেছে। ও তো আমাকে আগে দেখত, এখন মাঝেমাঝেই কেঁদে ওঠে...।

এই গজল, এই শায়র আমাদেরও কাঁদায়।

চিত্র পরিচালক অরিজিৎ গুপ্তাকে একটি সাক্ষাৎকারে উমাহানি বেগম জানান, 'কেউই জানে না আমরা কে,কোথা থেকেই বা এসেছি। নিজেদের পরিচয় আমরা বলতে চাই না, লোকে তামাশা করে।'

অন্যান্য নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মতো তাদেরকে জীবন সংগ্রাম করতে হয়েছে। ব্যথিত উমাহানি বেগম ওই সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন কেমনভাবে জীবনের ধারা বদলে গেল, যা ছিল, কেমন করে তা হারিয়ে গেল। এক সময় পুত্র মসিউদ্দিন সবজি কিনে বেচেছেন। উমাহানি বেগমের নাতি নাতনিগণ পড়েছেন অতিসাধারণ মানের বিদ্যালয়ে, সেখানে খুব অল্প সংখ্যক লোকই তাদের পরিচয় জানত।'

তাদের পূর্ব পুরুষ তৈরি করেছিল দিল্লির লালকেল্লা, হুমায়ুনের স্মৃতি সৌধ, আগরার দুর্গ, তাজমহলসহ অগুণতি দর্শনীয় ইমারত, অন্যান্য সাধারণ ভারতবাসীর মতো সেখানে প্রবেশের জন্য তাদের দাঁড়াতে হয়, অর্থের বিনিময়ে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হয়। উমাহানি বেগম কোনও দিনই দিল্লি যান নি।

লায়লা উম্মাহানি বেগমের চারপুত্র ও তিনকন্যা, তাঁরা যথাক্রমে—

(ক) ইয়াকুব জিয়াউদ্দিন টুসি

(খ) ইয়াকুব আরিফউদ্দিন টুসি

(গ) ইয়াকুব মসিউদ্দিন টুসি

(ঘ) শাজিউদ্দিন টুসি

কন্যাদের নাম—

১. মেহরুখ উম্মানি, ২. গুলরুখ উম্মানি, ৩. লাইলারুখ উম্মানি

৭.৬(১). জিয়াদ্দিন টুসি।

জয়াউদ্দিন টুসি বাহাদুর শাহ জাফরের লেখা গজল গাইতেন স্বাভাবিক দক্ষতায়। তিনি টিপু সুলতানের রাজ্যের টানা ৩৫ বছর সাদামাটা ও নিরাপদ চাকুরি করেছেন। অবসর নিয়েছেন রাজ্যে কৃষি বিপনন বিভাগ থেকে। আরিফউদ্দিন ও মসিউদ্দিন ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় বিদেশে যান, কিন্তু পরে ফিরে আসেন হায়দরাবাদে। সেখানে এসে বাস করতে থাকেন আশমান গড়ে। এক কথায় বিদেশে গিয়ে বিশেষ সুবিধা হয়নি। .[বাহাদুর শাহ জাফরের শেষ দিন গুলি : বিপ্রদাস বড়ুয়া, পৃ. ২৭]। অবসরের পর অতিসামান্য অবসরকালীন ভাতার উপর জিয়াউদ্দিন টুসির জীবন সংসার চলত। জিয়াউদ্দিনের মেজাজটি ছিল তাঁর পূর্বপুরুষদের মতো। বাড়ি ভাড়া দিতে হত ১২০০ (বারো শত) টাকা, মাসে

অন্তত দুবার ব্যবহার করতেন অতিমূল্যবান আতর 'দাহ—আল-ঔদ' যার ১৯৯২ সালে ১০ গ্রামের মূল্য ছিল ৪০০০ (চার হাজার) টাকা। এক ফোঁটা দাহ-আল্-ঔদ আতরের সামান্য একটু অংশ মাখলে টানা আটদিন পর্যন্ত তাঁর সৌরভ থাকত। তাঁর পূর্বপুরুষ মির্জা প্যায়ারের কাছ থেকে নাকি চব্বিশ ঘণ্টা ওই আতরের সুগন্ধ বের হতো। জিয়াউদ্দিনের পিতা মইনুদ্দিন টুসি। তাঁর শ্বশুর বা উমাহানি বেগমের পিতা মির্জা প্যায়ারে, অর্থাৎ জিয়াউদ্দিনের মাতামহ ছিলেন শৌখিন লোক। গান-বাজনা, শাহি খাবার, পোশাক ইত্যাদি নিয়েই তিনি থাকতেন। তাঁর আয় যে বিশাল ছিল তাও নয়।

এক সাক্ষাতে জিয়াউদ্দিন জানিয়েছিলেন ১৯৫২ সালে তিনি অষ্টম শ্রেণিতে পড়তেন, বয়স ছিল তেরো অথবা চৌদ্দ, রিকাভগঞ্জের বাড়িতে ছিল বিশাল গ্রন্থাগার, তাতে ছিল ফারসি ভাষায়লেখা মির্জা খোয়াযেশ ও মির্জা আবদুল্লার স্মৃতিকথা। এই সময় মুম্বাইয়ের (তখন বোম্বাই) এক ব্যক্তি পুরাতন পাণ্ডুলিপি কিনবেন বলে বিজ্ঞাপণ দেন। মাত্র ৩২ টাকায় প্রায় গোটা গ্রন্থাগারটি চলে যায় তাঁর দখলে। সম্বিত ফিরতে অনেক দেরি হয়েছিল। ওই সময় আপশোস করা আর কিছুই ছিল না [১৯৫২ সালে ১০ গ্রাম সোনার মূল্য ছিল ৭৬.৮১ টাকা।]

জিয়াউদ্দিনের শৈশব কেটেছিল দারিদ্রের মধ্যে। স্বাধীনতার পর নিজামের হায়দরাবাদ দখল করে ভারত সরকার। যাবতীয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা হয়। সংসার চালানো হয় কঠিন কাজ। দৈনিক ১ টাকা হারে ১৫টি রিকশা হায়দরাবাদে চলত, এই ১৫টি রিকশার মালিক ছিলেন উমাহানি বেগম। সন্ধ্যায় টাকা আদায়ে যেতেন জ্যেষ্ঠ পুত্র জিয়াউদ্দিন।

ইংরেজরা হিন্দুস্থান পরিত্যাগের আগে ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছিল। উমাহানি বেগমের বয়স তখন মাত্র ২৫, মাঝে মাঝে অসময়ে দরজায় টোকা পড়লে সম্ভ্রম বাঁচাতে যুবতী উমাহানিকে লুকিয়ে পড়তে হত দোতলার ছোট্ট এক অন্ধকার ঘরে। একবার এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন :

"যা নজরানা দিয়া যাতা থা উয়ো সব বন্ধ, জাগিরদার জব্দ। পুরা হাম লোগোনে অ্যায়সা বানা দিয়া পুরো ঘরোমে ঘুসকে জেবরাত লে লিয়া। উস ওয়াক্ত সে ম্যায় বিলকুল জওয়ান থি। নিজাম সরকার আপনে মসনদসে হঠ্ গয়ে, হম বিলকুল ফকির বন গয়ে। [পূর্বোক্ত : পৃ. ২৬]।"

ইংরাজি সংবাদপত্র The Times of India হায়দরাবাদ সংস্করণে জিয়াউদ্দিন টুসি ও মোগল বংশধর প্রসঙ্গে একটি সংবাদ প্রকাশ করে ২৭ এপ্রিল, ২০১০, ওই

সময় তিনি শহরে এক নিম্নমধ্যবিত্ত অঞ্চল চঞ্চল গুড়া (Chanchal guda) এলাকায় বাস করতেন। বাস করা বলতে রীতিমতো জীবন যুদ্ধ চলছিল। ছোট্ট এক ভাড়া ঘরে তিনি থাকতেন। তাঁর প্রতিবেশীগণও জানত না যে তিনি মোগল বংশধর। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ১০০ টাকার 'তৈমুরি' বৃত্তি দেওয়া হত মোগলদের যে সমস্ত বংশধর পড়াশুনা করতেন তাঁদের জন্য। ২০০৪-০৫ অর্থবর্ষ পর্যন্ত ওই বৃত্তি প্রদান জারি ছিল, কিন্তু তার পর থেকেই ওই বৃত্তি বন্ধ করা হয়। জিয়াউদ্দিন টুসি ওই সাক্ষাৎকারে বন্ধ হওয়া বৃত্তি চালু করবার দাবি করেন। চূড়ান্ত আর্থিক সংকটে মোগল বংশধর ও তাদের সন্তানগণ ছিল। তিনি ওই বৃত্তি ৮০০০ টাকা দাবি করে ছিলেন, কিন্তু হায়, তাঁর আশা পূরণ হয়নি।

এক সময় তাদের শোচনীয় পরিস্থিতি জানিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছেও আবেদন করেন, তাঁরা কিছুটা সক্রিয় হলেও ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সদর্থক সাড়া মেলেনি।

ক্ষোভ উগরে দিয়ে Gulf News কে (১৫/৬/২০০৬) জানান : "দিল্লিতে জাফরের নামে শুধু একটা রাস্তার নামকরণ হয়েছে মাত্র। আমরা আরও স্বীকৃতি চাই। তবে অভিযোগ করছি না। সরকার এই নিশ্চয়তা দিয়েছে যে আমাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"

৭.৬ (২) : মসিউদ্দিন টুসি।

মাতামহ প্যায়ারে মির্জা পছন্দ করতেন শাহি খাবার, তিনি ছিলেন খাদ্যরসিক, ভোজন প্রিয়। মোগল হারমের রন্ধনশালায় রান্না হত বিচিত্র সমস্ত খাবারের পদ। সাম্রাজ্য চলে গেলেও শাহি মেজাজটি ছিল প্যায়ারে মির্জার। মসিউদ্দিন সেই মোগলদের বিবিধ খাবারের পদ নিয়ে গবেষণা করতেন। বাবর, আকবর, জাহাঙ্গির বা শাহজাহানের প্রাতঃরাশ, অথবা তাদের দুপুরের বা রাত্রির খাবার। কী রকম ছিল তা নিয়ে একসময় রীতিমতো গবেষণা করতেন হায়দরাবাদের শেরাটন গোষ্ঠীর একটি পাঁচতারা হোটেলে। সেখানে তিনি সেই অর্থে চাকুরি করতেন না। চাকুরি শব্দের উৎস চাকর বা নোকর, যা মোগল বংশমর্যাদায় ঘা দিত। সেখানে কাজ করতেন খাদ্য-বিশারদ বা উপদেষ্টা হিসাবে। আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মসম্মান তো অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করা যায় না, তাই না খেয়ে থাকাটা, অর্থের অভাবটা তুচ্ছ হয়ে দাঁড়ায়।

খাদ্য গবেষণা বা পূর্বপুরুষদের ঘরাণার ঐতিহ্য ধরে রাখতে মসিউদ্দিনকে সাহায্য করতেন তাঁর মা উমাহানি বেগম। তিনিও চাইতেন মোগল ঘরাণায়

তৈরি খাবারের রন্ধন পদ্ধতি যেন বজায় থাকে। এ বিষয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় [১০/১১/২০০২] যা অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

"এ ব্যাপারে আমার মা-ই আমার প্রফেসর, শেরাটনের ফুড কনসালটেন্টের স্বীকারোক্তি। এখন সম্পূর্ণ বিশ্রামে চলে যাওয়া উমাহানি একসময় এক হাতে ষাট-সত্তর জনের জন্য রান্না করতেন। মির্জা পেয়ারের কাছে শুনে শুনে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন পরিবেশনের ধরন। সব সময় যে নিজে সব করতেন তা আদৌ নয়। নিজামের তো অর্থের অভাব ছিল না। মির্জা পেয়ারে রেখে দিয়েছিলেন অনেক খানসামা, বাবুর্চি। তবে, একটা জিনিস ছোটবেলা থেকেই নিজের হাতে করতেন উমাহানি। এখনও এই দুর্বল অশক্ত হাতে সমান নৈপুণ্যে করে চলেছেন তা। সেটি হল পান সাজা। আর কী অনবদ্য সেই পানের খিলি, এমন রেশমের মতো পান সাজা বোধহয় শুধু মোগল-নারীর পক্ষেই সম্ভব। এই পান-সাজার সবচেয়ে সূক্ষ্ম যে অংশটুকু হারেমের বিবিরা আগে শুধু সেই টুকুই করতেন। বাকিটা সাজার জন্য মাইনে দিয়ে লোক রাখা হত জাফরের সময়েও। সেই অংশ টুকুকে বলা হত 'বেগমত-ই ছালিয়া'। ব্যাপারটি আর কিছুই নয়, বিশেষ মাপে চৌকোনা করে কাটা সুপুরি। বিশেষত্বটা হচ্ছে সুপুরির প্রতিটি ছোট্ট চৌকো টুকরো মাপ হুবহু এক। এবং এমন কৌশলে কাটা, যাতে ধারের অংশগুলি খুব বেশি ধারালো না হয়ে যায়। মুখে দিলে জিভে যেন চোট না পড়ে। ঠিক ওই একই কারণে পানের বোঁটা ও শিরা উপশিরাগুলিও যতটা সম্ভব তুলে ফেলা হয়।

এখনও দিনে কম করে পঞ্চাশটা জর্দা দেওয়া পান খান উমাহানি। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় তৈরি করেন 'বেগমত-ই ছালিয়া'। যা দেখলে মনে হবে মেশিনে কাটা হয়েছে বুঝি।

উজবেকিস্তান থেকে আসা ঘরানা কীভাবে হিন্দুস্থানের সংস্পর্শে এসে ক্রমাগত বদলাল, প্রতিটি ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে মশলার রকমফের করা হত, রেফ্রিজারেটরহীন সেই সময়ে টানা পনেরো দিন কোন কৌশলে টাটকা রেখে দেওয়া হত রান্না করা মাংস—এসবই মসিউদ্দিন শিখেছেন তাঁর মায়ের কাছ থেকে। আদ্যোপান্ত পড়ে ফেলেছেন বাহাদুর শাহের লেখা রন্ধন পুস্তিকা 'খানা-ই-জাফর'।

মসিউদ্দিনকে দেখলে মনে হবে এখনও তিনি সেই স্বপ্নের রান্নাঘরেই থেকে গিয়েছেন। পোশাকটাই যা বদলে গিয়েছে। চোগা-চাপকানের বদলে টেরিকটের জামা। স্বপ্নের রান্নাঘরের বিশষজ্ঞ খানসামারা যে শুধু ইরান, আফগানিস্তান, তুর্কি বা বালাগ থেকে আসতেন তা-ই নয়। দামাস্কাস, বাগদাদ, এমনকী আরব

থেকেও নিয়ে আসা হত ওস্তাদ বাবুর্চি। সেখানকার রান্নার ধাঁচের সঙ্গে ভারতের শস্য ও মশলা মিশিয়ে এখানকার আবহাওয়ার উপযুক্ত ডায়েটের ব্যবস্থা প্রথম করেন জাহাঙ্গির। বন্য পশু-পাখির সঙ্গে মিলে যেতে থাকে চন্দনভস্ম, কেওড়া, গুলাব। সদাব্যস্ত সামরিক বাহিনীর পক্ষে উপাদেয় ও চটজলদি খাদ্যের সন্ধানই জন্ম দেয় সেই সব খাবারের, যা আজ ফাস্ট ফুড নামে লক্ষ লক্ষ রসনাকে তৃপ্ত করছে। সৃষ্টি হয় শুকনো কাবাব, লস্কর-ই-নান, দম-কা-বাইগনের।

এসব তো রয়েছেই। তবে সেই আমলের সবচেয়ে চমকপ্রদ বস্তুটির নাম 'কুশতা গোলি'। চকমপ্রদ, কারণ ওই 'ম্যাজিক গোলি'ই ছিল মোগলদের সুবিশাল হারেম বজায় রাখার আসল রহস্য। যা এখন ঠিকমতো বিপণন করতে পারলে ভায়াগ্রাও মার খেয়ে যাবে।

উমাহানির ছোট ছেলে সাজিউদ্দিনই সেই ম্যাজিক গুলির রহস্যটা ভাঙলেন। সৌদি আরব থেকে ফিরে ছোটখাটো একটি স্কুল গড়েছেন এই সাজিউদ্দিন। এঁরও অবসর কাটে পুরনো রেসিপির চর্চায়। অবশ্য কুশতা গোলি কখনও চেখে দেখার সাহস পান নি সাজি। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। বিশ থেকে পঁচিশটি বিশেষ জাতের মুরগিকে বিশেষ যত্ন নিয়ে পালন করা হত। অন্যান্য মুরগির সঙ্গেই থাকত তারা। এই বিশেষ মুরগিগুলিকে বাদাম, পেস্তা, আখরোট, চিলকোজা, আখরখোরাসহ ২০ থেকে ২২ রকমের শস্য দুধের সঙ্গে লেই করে খাওয়ানো হত। সঙ্গে থাকত নিক্তিতে মাপা স্বর্ণ ও রৌপ্যভস্ম। মুরগিগুলি যখন তিন মাসের হয়ে যেত তখন তাদের একটিকে কেটে সসেজ বানিয়ে বাকিদের খাওয়ানো হত। এই পদ্ধতিটি চলতে চলতে মুরগির সংখ্যা কমে আসত পাঁচ-দশটিতে। ততদিনে তারা বেড়েও উঠত কিছুটা। সেই তৈরি মুরগিগুলিকে শেষ পর্যন্ত কেটে তাদের মাংস দিয়ে গোলি বানানো হত। এই গুলির অনেক গুণ। আশি বছরের বৃদ্ধকে খাওয়ালে তার বয়স কমে আসবে বিশ-বাইশে। বিয়ে করা সম্ভব হবে আশি বছর বয়সেও। হারেম বজায় রাখার জন্য এই গোলি অত্যাবশ্যক ছিল সে সময়। আর এই রেওয়াজ ধরে রেখেছিলেন মির্জা পেয়ারে অবধি। এই গোলি তৈরির সমস্ত উপকরণের হদিশ রয়েছে জিয়াউদ্দিন টুসির কাছে। কিন্তু, সেই বংশাভিমান! রাজকীয় ঐতিহ্যের ব্যাপার। এই জিনিসটি আমজনতার জন্য বলে তিনি মনে করেন না। তাই তার শুলুকও দিতে চান না সবাইকে। [এরকম ম্যাজিক-গুলির কথা লেখা আছে আরব্য রজনীতে।]

আসলে চারজন বৈধ পত্নী ছাড়াও প্রায় চল্লিশ জন 'খাওয়ায়েশ' ছিল বাহাদুর

শাহের। পরবর্তীকালে সেই ট্রাডিশন ধরে রেখেছিলেন মির্জা পেয়ারেও। এমনকী আমার বাবারও ছিল। এর মধ্যে লুকোছাপা কিছু তো নেই।

এই 'খাওয়ায়েশ' ব্যাপারটি বেশ অদ্ভুত। এঁরা নর্তকী, তওয়ায়েফ বা বাঈজি নন। এমনকী রক্ষিতাও নন। অবৈধ স্ত্রী বলা চলতে পারে। তাঁদের আলাদা হাভেলি থাকত। তাঁরা মাসোহারা পেতেন। যথেষ্ট সম্মানও। পতিজ্ঞানে সেবা করতেন বাদশাহের। এমন কী তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গেও ভাল সম্পর্ক থাকত এই খাওয়ায়েশদের।"

উজবেকিস্থানে বাবরকে বীর নায়কের সম্মান দেওয়া হয়। ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ তাসখন্দে বাবরের জন্মের ৫১০ বছর উপলক্ষে মসিউদ্দিন, জিয়াউদ্দি ও সাজিউদ্দিনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়; ১৪৯৪ সালে সপরিবারে বাবর তাঁর পৈত্রিক এলাকা পরিত্যাগ করেছিলেন অনেকটা পদব্রজেই, তার ঠিক ৫০০ বছর পর ১৯৯৪ সালে হায়দরাবাদ থেকে উজ্‌বেকিস্থান পৌঁছন সেই বাবরের বংশধর। ৩০০ একর জমির উপর 'বাবুরি-বাগ' (বাবরের বাগিচা) নামকস্থানে সেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মসিউদ্দিন ও তাঁর অন্যান্য ভাইদের উজবেকিস্থান প্রশাসনের পক্ষ থেকে নাগরিকত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয় কিন্তু তাঁরা সেই প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন, উজবেকিস্থানের মাটিতে পা দিয়েই তাঁরা একটা অন্যরকম টান অনুভব করেছিলেন। একথা সত্যি, একথা সত্যি ওই দেশ ছিল তাদের পূর্বপুরুষদের ভূমি, তা সত্ত্বেও স্থায়ীভাবে হিন্দুস্থান ছাড়া অন্য কোথাও থাকবার কথা তাঁরা মনেও আনেন নি। তাঁদের জন্মভূমি হিন্দুস্থান—ভারতবর্ষ, উজবেকিস্থান ছিল তাঁদের পূর্বপুরুষদের জন্মভূমি, দুটি দুরকম অনুভূতি।

একখণ্ড জমির জন্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে তাঁরা আবেদন করেছেন, প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়, দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার, কোথাও বাদ দেন নি। কিছুই সুফল মেলেনি।

"হাম আপনি আহ শুনায় তো শুনায়ে কিসকো?
ফরিয়াদ করে তো কিসসে?
কোই হমারা শুননেওয়ালা নহি।
ইসসে তো বেহতর হ্যায় খামোস রহনা।"

প্রশাসন, সমাজব্যবস্থা যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তাঁদের কথা শুনবে না, সেই পরিস্থিতিতে চুপ করে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছিলেন মসিউদ্দিন ভাইয়েরা ও তাদের সন্তান সন্ততিগণ নতুন প্রজন্ম শুধুমাত্র ইতিহাসের বইতে

তাঁদের পূর্বপুরুষদের কথা পড়েন, তাঁদের সম্বন্ধে কেউ বললে চুপচাপ শোনেন। তাছাড়া আর কী বা করবার ছিল বা আছে?

এক সাক্ষাৎকারে মসিউদ্দিন Gulf News কে জানান (১৫/৬/২০০৬) : "কাগজে কলমে বাহাদুর শাহ জাফরকে রেঙ্গুনে সমাধিস্থ করা হলেও আমাদের বিশ্বাস গবেষণার জন্য তাঁর দেহাংশ লন্ডন নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।"

মসিউদ্দিন বলেছিলেন যে তাদের প্রতিটি পরিবারের জন্য ১০০০ বর্গ মিটার জায়গা যথেষ্ট। মেলেনি। অসংখ্য আবেদন নিবেদন সবই ব্যর্থ হয়েছিল। আধুনিক প্রজন্ম তাদের বংশমর্যাদা বা অতীতের গরিমা নিয়ে আদৌ ভাবতে রাজি নয়, তারা বাঁচতে চায় নিজেদের মতো করে।

৭.৭. প্রকৃত মোগল বংশধর কে?

হায়দাবাদের মোগল বংশধরগণের মতে কলকাতা বা হাওড়ার সুলতানা বেগম মোগল বংশের পুত্রবধু, তাঁর শরীরে মোগল রক্ত নেই। দ্বিতীয়ত, মহাবিদ্রোহ আরম্ভের আগেই মির্জা ফকরু মারা যান এবং তাঁর পরিচারিকা প্রয়াত মির্জা ফকরুর শিশু পুত্রকে নিয়ে পালিয়ে যান। ওই সময় ওই শিশু পুত্র মির্জা ফরখুন্দা জামালের বয়স ছিল মাত্র চার বছর। বহু বছর তাঁকে অন্তরালে রাখবার পর হঠাৎ পরিচয় করানো হল মির্জা ফকরুর পুত্র বলে। তাদের মতে "আমরা কেমন করে এ কাহিনি বিশ্বাস করব? সে যে ওই পরিচারিকার পুত্র ছিল না তারই বা প্রমাণ কী? মির্জা ফকরু ইংরেজদের কাছ থেকে অনেক ব্যক্তিগত সুবিধা পান এবং আমরা তাঁকে ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে গণ্য করি।

ঠিক একই রকম বক্তব্য পেশ করেছিলেন পাকিজা সুলতান বেগম। তিনি হায়দরাবাদ বা কলকাতায় বসবাসকারী মোগলপরিবারের সদস্যদের কর্তব্যের মধ্যে আনেন নি বা গুরুত্ব দেন নি। [৬.৪ দ্রষ্টব্য]

হাওড়া (প.ব.) তে বসবাসকারী সুলতানা বেগম দাবি করেছেন তিনিই মোগল বংশের প্রকৃত খাদদান।

৭.৮. আত্মপ্রচার সর্বস্ব ইয়াকুব হাবিব উদ্দিন টুসি।

মোগল বংশধরগণের সাক্ষাৎ পেতে ২০১৭ সালের শেষ দিকে সস্ত্রীক হায়দরাবাদে যাই। ইন্টারনেট মারফত ইয়াকুব হাবিবউদ্দিন টুসি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত মোগল এম্পারারস লজিসটিক প্রাইভেট লিমিটেডের একটি ঠিকানা পাই। ঠিকানাটি ছিল এই রকম—

৫-৯-১২ একতলা
সম্রাট কমপ্লেক্স,
অ্যাকাউন্টান্ট জেনারেলের দপ্তরের বিপরীতে,
সফিয়াবাদ, হায়দরাবাদ, ৫০০০০৪

উক্ত ঠিকানায় পৌঁছই, কিন্তু পার্শ্ববর্তী দোকানদারগণের কথাতে হতাশ হই। গত এক বছর ধরে নাকি ওই অফিস বন্ধ। বন্ধ কেন? জিজ্ঞাসা করতেই পাশের দোকানের জনৈক নিরাপত্তা রক্ষী জানান, 'ক্যায়া লাফরা হুয়া মুঝে মালুম নহি।' অফিসের সাইনবোর্ডে লেখা তিনটি টেলিফোন নং লিখে হোটেলে ফিরি। দুটি নম্বরের কোনও অস্তিত্ব ছিল না, তৃতীয় মোবাইল নম্বরটি বাজে কিন্তু কেউ ফোনটি রিসিভ করেনি। একাধিকবার ফোন করেও হতাশ হলাম। শেষে আমার পরিচয় ও উদ্দেশ্য জানিয়ে মেসেজ পাঠাই। একই বার্তা দুই, তিনবার পাঠানোর পর ইয়াকুব হাবিবউদ্দিন টুসি ফোন করেন। সুদূর কলকাতা থেকে কেন টাকা খরচ করে হায়দরাবাদ ছুটে এসেছি তা জানালাম, পুনরায় আমার পরিচয় দিলাম। ইতিপূর্বে কী কী কাজ করেছি (গ্রন্থ রচনা বিষয়ে) তা বললাম। সম্ভবত, উনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন। পরদিন সকাল সাড়ে দশটায় আমার হোটেলে গাড়ি পাঠাবেন সাক্ষাতের জানালেন (হায়দরাবাদ রেল স্টেশনের খুব কাছে নামপল্লীতে ছিলাম)। আমি ও আমার স্ত্রী খুবই উত্তেজিত ছিলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করব ভেবে। দশটার সময় তিনি এস. এম. এস. করে জানালেন সাড়ে দশটা নয়, তিনটের সময় তিনি সাক্ষাৎ করবেন এবং আগের স্থানটি তিনি বদল করলেন। আমরা একটু হতাশ হলাম। তিনটে বাজলেও নির্দিষ্ট গাড়ি এল না, এল এস. এম.এস., পুনরায় সাক্ষাতের স্থান পরিবর্তন এবং সময় জানালেন সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা। আমি বিরক্ত হলাম, হোটেলের ম্যানেজার জানালেন জায়গাটা হোটেল থেকে অন্তত পঁচিশ কি.মি. দূরে, শহরের বাইরে এবং অসামাজিক লোকজনের বাস। সেখানে যাওয়া উচিত হবে না জানালেন। চূড়ান্ত বিরক্তিতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানালাম এস.এম.এস. মাধ্যমে। হাবিবউদ্দিন টুসি হায়দরাবাদ শহরে আসতে চাইছিলেন না, নিরাপত্তাহীনতার প্রসঙ্গ তুললেন, কারণ জানালেন না। কথা দিলাম হোটেলের চার দেওয়ালের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে, তিনি আমায় বিশ্বাস করলেন না এবং এলেনও না। হতাশ হয়েই বাড়ি ফিরলাম। সাক্ষাৎ না হলেও ইয়াকুব টুসির সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ জারি রইল।

অনেক পর তিনি আমায় বিশ্বাস করলেন। জানালেন, উরস উৎসব উপলক্ষে

ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে বর্ধমান যাবেন এবং আমার বাসভবনে আসবেন। ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ আমার বাড়ি এলেন, আলোচনা হল, কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারলাম না ও মন ভরল না। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম তিনি সঠিক তথ্য দিচ্ছিলেন না, তথ্য গোপন করছিলেন। তাঁরই দেওয়া তথ্যানুসারে জানা যায় হায়দরাবাদে আশিজনের বেশি মোগল বংশের সদস্য বসবাস করেন। কিন্তু তাদের একজনেরও ঠিকানা বা ফোন নম্বর জানালেন না। তাঁর কাছে নাকি নেই, তাঁর নিজের ভাইয়ের ঠিকানা বললেন না। তিনি এত ব্যস্ত যে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয় না। ফেসবুকে তাঁর পঞ্চাশ হাজারের বেশি বন্ধু, কিন্তু নিজের ভাই, বোন, খুড়তুতো, মাসতুতো ভাই-বোন, জ্যাঠা, কাকাদের ঠিকানা জানেন না। আসলে তিনি জানাবেন না তা বুঝে গিয়েছিলাম। আধুনিক প্রযুক্তি হোয়াটস অ্যাপে প্রতিদিন গাদাগাদা যে তথ্য পাঠান তার সবেতেই নিজের ছবি এবং রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যৌথ ছবি। এছাড়া আর কিছুই নেই। হায়দরাবাদের মুঘলদের বিস্তারিত ও সম্পূর্ণ বংশতালিকা পাঠাতে বললে তিনি শুধুমাত্র নিজের টুকু পাঠিয়েছেন এবং সেটাও অস্পষ্ট, পড়ে সারমর্ম উদ্ধার করা যায় নি। অন্তত একশতবার জানানো সত্ত্বেও স্পষ্ট ও বিস্তারিত তালিকা পাঠান নি। আরও জানি এবং আমি নিশ্চিত তিনি পাঠাবেন না।

তিনি দাবি করেছিলেন যে ভারত সরকার তাঁকে Prince খেতাব ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু প্রমাণ পত্র দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে অনুমতি ছাড়া তিনি কেন ওই খেতার ব্যবহার করছেন তার সদুত্তর দেন নি, এমনকী তাঁর নাবালক পুত্র ও কন্যাদের নামের আগেও ওই খেতাব ব্যবহার করেন।

তিনি যে শূন্যগর্ভ কলসি এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই এবং পাছে তাঁর স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় তাই অন্য কোনও সদস্যদের ঠিকানা বা যোগাযোগ করবার মতো তথ্য দিতে রাজি হন না। বর্ধমানের উরস উৎসব কমিটির সদস্যগণ-ও ইয়াকুব হাবিব উদ্দিন টুসি সম্বন্ধে চূড়ান্ত হতাশ হয়েছিলেন। দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সংস্থার আহ্বানে তিনি সারা বছর ঘুরে বেড়ান, রাষ্ট্রপতিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ছবি তোলা এবং তা হোয়াটস অ্যাপের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াই তাঁর কাজ ও পেশা।

৭.৯. নিষিদ্ধ তথ্যচিত্র।

অরিজিৎ গুপ্ত হায়দরাবাদে বসবাসকারী লায়লা উমাহানি বেগম ও অন্যান্য মোগল বংশধরগণকে নিয়ে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন এবং বিভিন্ন চ্যানেলে তার প্রদর্শন আরম্ভ হয়। সঠিক তথ্য তুলে ধরা হয় নি এই অভিযোগ তুলে হায়দরাবাদ সিটি সিভিল আদালতে মামলা হয় এবং মহামান্য আদালত ওই ধারাবাহিক সম্প্রচারের উপর নিষেদাজ্ঞা জারি করে ৮ ডিসেম্বর, ২০০২ খ্রি., বলা যায় ওই তথ্য চিত্রের মাধ্যমেই সাধারণ মানুষ হায়দরাবাদের মোগল বংশধরগণ সম্বন্ধে জানতে পারে। কিন্তু তাদেরই আপত্তিতে তা বন্ধ হয়ে যায়। ৯ ডিসেম্বর, ২০০২, The Hindu দৈনিকে ওই সম্বন্ধে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

[শুধুমাত্র এই তথ্যটুকু পেয়েছি যে হায়দরাবাদের মালেকপেট থানাস্থিত আশমানগড় অঞ্চলে টুসি পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ থাকেন। যদি কোনও ব্যক্তি ওই বিষয়ে আরও তথ্য দিতে পারেন কৃতজ্ঞ থাকব। অন্যান্য সদস্যদের খুঁজে বের করবার প্রক্রিয়া জারি রয়েছে।]

৭.৯ : মোগল বংশের হায়দরাবাদ শাখার বংশতালিকা।

বাহাদুর শাহ জাফর

↓

মির্জা খোয়ায়েশ + (পত্নী) আশরাফ মহল

↓

মির্জা আবদুল্যা

↓

মির্জা গফফর ওরফে মির্জা প্যায়ারে + (পত্নী) হাবিবা বেগম

↓

ক. মির্জা ইউসুফ	খ. লায়লা উসাহানি বেগম + (স্বামী) মুইনুদ্দিন টুসি	গ. হুসান জাহানয়ারা বেগম + স্বামী সুনাবর মহম্মদ

↓

৪ (চার) পুত্র

১. ইয়াকুব জিয়াউদ্দিন টুসি (মৃত্যু ২০১৫) ৩ (তিন) পুত্র

২. ,, আরিফউদ্দিন টুসি (মৃত্যু ১৯৮৬) ১. মুহ, বাবর

৩. ইয়াকুব মসিউদ্দিন টুসি (মৃত্যু ২০১০)
৪. ,, সাজিউদ্দিন টুসি (অসুস্থ)

২. ,, আসকর
৩. ,, বোকর বুখার

৩ (তিন) কন্যা
১. মেহরুখ উস্মানি
২. গুলরুখ ,,
৩. লাসলারুখ ,,

২. আরিফউদ্দিন টুসি
↓
ইয়াকুব হাবিবউদ্দিন টুসি (জন্ম ১.১.১৯৬৯)
↓
জালালউদ্দিন টুসি — নুরুল আইনারা হাবিবা

৩ (তিন) কন্যা
১. আখতার ফতিমা
২. নাদের ,,
৩. নায়ার ,,

পরিশিষ্ট ১

Bengali Jamait, Rangoon

I, Mirza Jamshed Bukht of Delhi, presently resident of Rangoon, s/o Mirza Jawan Bukht Shah, am in good health and sound state of mind. I, with my own accord and without any sort of compulsion, marry Nawab Nadir Jahan Begum d/o Mushi Piyare Mirza residing at present in 31/29th Street, Rangoon, according to Hanafi Laws pf Shara Shariat, on attorneyship (wakalat) of Mohammad Hanif and testimony (shahadat) of Isa Imam and Syed Bashir Ahmed before the audience in lieu of a Mahar of Rs. 25,000/- unpaid.

I accept the following conditions and write them here so that they may be useful to the bride Nawab Nadir Jahan Begum at the time of necessity.

(1) That whenever the bride will want her mehar, I will give it to her.

(2) That 1 will support and clothe her and give her a house to reside in.

(3) That 1 will keep her in parda with respect and chastity and five with her happily.

(4) That without her consent, I will not marry.

(5) That when I will go on any travel or voyage, I will give her six months' expenses. But after this time I do not send her expenses, I will be responsible for her doings which she will do in my absence.

(6) That I will not forbid her from taking part in the festi vities and deaths other relatives on condition that they be according to Shara Shariat.

(7) That 1 will give her maintainance according to my ca-

pacity during my life time whether she be in union or disunion with me.

(8) That I will not be an hindrance to her in her visits fo her relatives.

(9) That I heartily accept Rs.25,000/-of mehar (of present coin) of which Rs.12,500/-half.

I have written the above lines in good condition of health and mind and agree with my own accord to the above mentioned conditions and leave this paper as a matter of proof for future use.

Sd/ Jamshed Bukht (now Shah)
Sd/- Mohammad Hanif

Witnesses
Sd/-Bashir Ahmad
Sd/-Sulajman Saheb

Witnesses
Sd/-Hakim Abdul Karim
Sd/-Munny

Written by Noor Mohammad, Pesh Imam, Bengali Masjid
Nakahnama.....Sd/-Mhammad Esoof
Dated 19th Guhja, 1337, or 15th September, 1919

পরিশিষ্ট ২

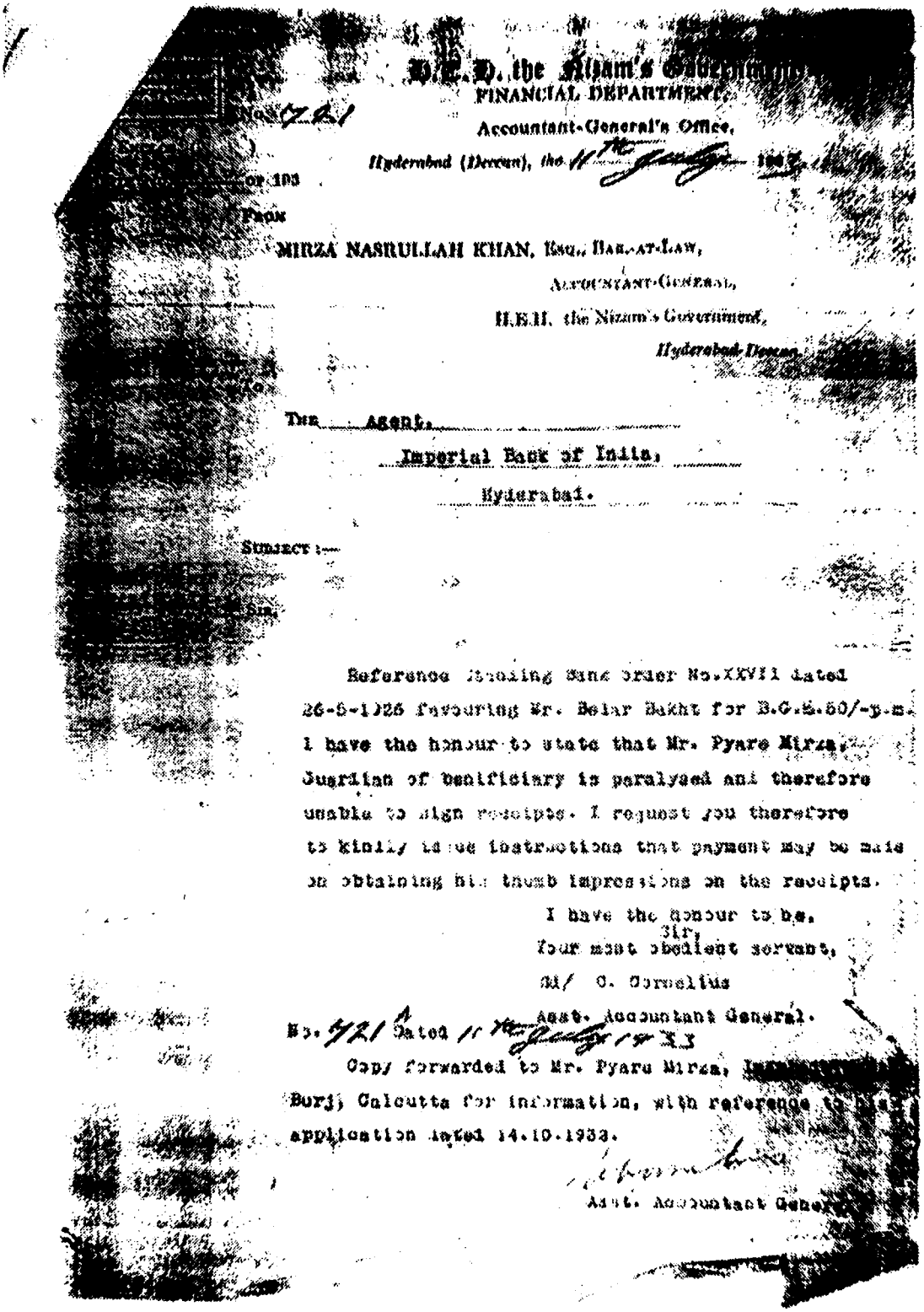

H.E.H. the Nizam's Government
FINANCIAL DEPARTMENT.

No. 721

Accountant-General's Office,

Hyderabad (Deccan), the 11th January 1934

of 193

FROM

MIRZA NASRULLAH KHAN, Esq., Bar.-at-Law,
Accountant-General,
H.E.H. the Nizam's Government,
Hyderabad-Deccan.

To

The Agent,
Imperial Bank of India,
Hyderabad.

SUBJECT :—

Sir,

Reference standing Bank order No. XXVII dated 26-5-1926 favouring Mr. Bedar Bakht for B.G.Rs.50/-p.m. I have the honour to state that Mr. Pyare Mirza, Guardian of benificiary is paralysed and therefore unable to sign receipts. I request you therefore to kindly issue instructions that payment may be made on obtaining his thumb impressions on the receipts.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
Sd/ C. Cornelius
Asst. Accountant General.

No. 721 A Dated 11th January 1934

Copy forwarded to Mr. Pyare Mirza, [illegible] Burj, Calcutta for information, with reference to his application dated 14.10.1933.

Asst. Accountant General.

পরিশিষ্ট ৩

IMPERIAL BANK OF INDIA

COPIED

ALL LETTERS TO BE ADDRESSED TO
THE AGENT
TELEGRAPHIC ADDRESS
"THISTLE"

HYDERABAD 13th Aug. 1942
DECCAN

No. R.L.S. 22
3079

Md. Mirza Bedar Bakht,
Mahala Mahjidpur Khurd,
Bahgalpur, Bihar Province.

Dear Sir,

In terms of instructions received from the Nizam's Govt., we shall be glad if you will arrange to submit the receipts to us in future direct, to enable us to remit the amount to you by Money Order. Your Life Certificate should also be submitted as usual.

The arrangement for payment of your allowance through our Calcutta Office has been cancelled.

Yours faithfully,

p. Agent.

Boier Somahar
Click here
to join our Telegram Channel

পরিশিষ্ট ৪

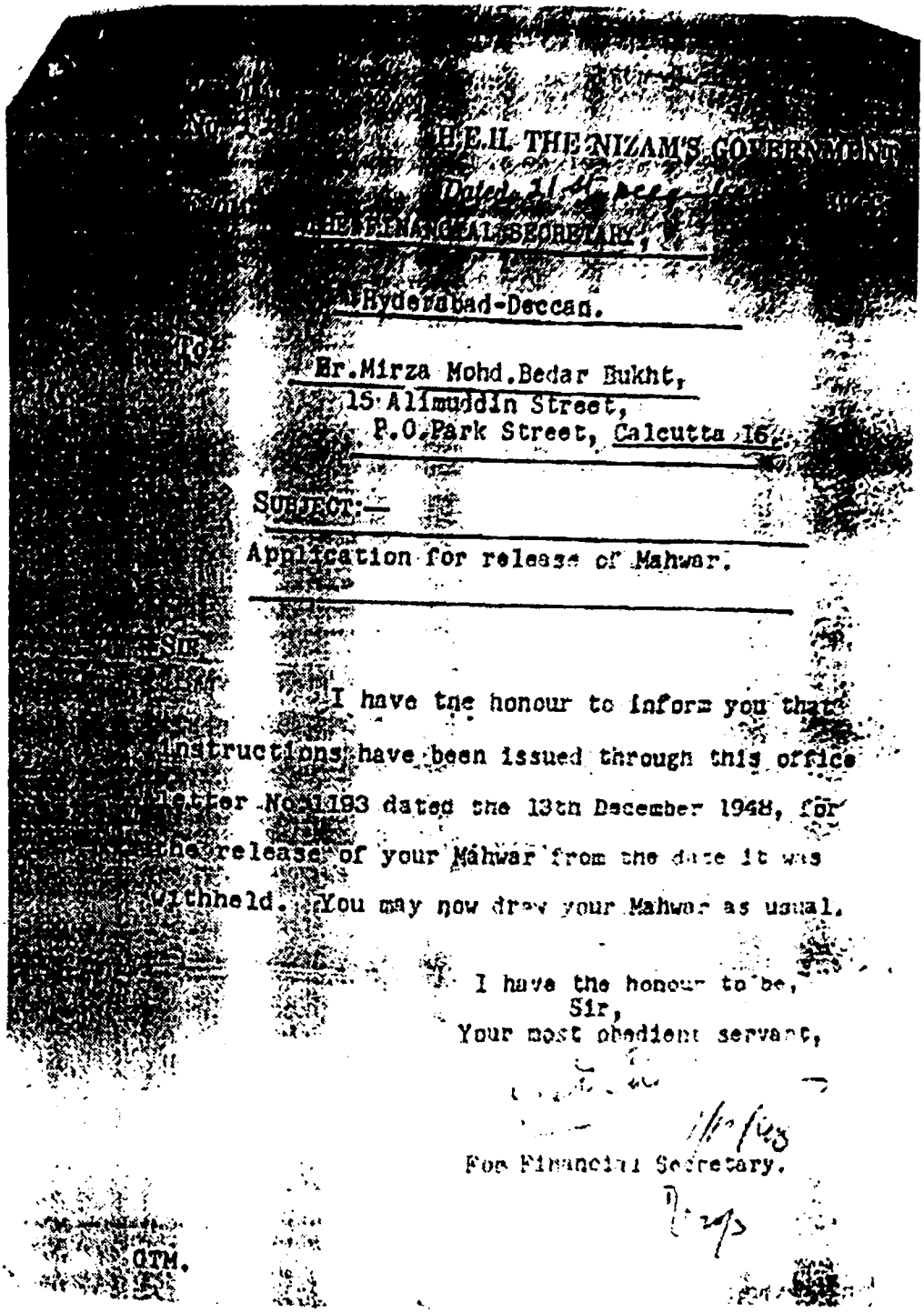

H.E.H. THE NIZAM'S GOVERNMENT

Dated [illegible]

THE FINANCIAL SECRETARY,

Hyderabad-Deccan.

To,

Mr. Mirza Mohd. Bedar Bukht,
15 Alimuddin Street,
P.O. Park Street, Calcutta 16.

SUBJECT:—

Application for release of Mahwar.

Sir,

I have the honour to inform you that instructions have been issued through this office letter No. 1183 dated the 13th December 1948, for the release of your Mahwar from the date it was withheld. You may now draw your Mahwar as usual.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,

[illegible]

For Financial Secretary.

GTM.

পরিশিষ্ট ৫

IMPERIAL BANK OF INDIA

THE AGENT

HYDERABAD 16th February 1949
DECCAN

No. [illegible]

Prince Mirza Mohammed Baydar Bukht,
c/o Mahboob Bakhsh Mokhtar
Barahpura,
Bhagalpur,
Behar.

Dear Sir,

We are in receipt of your letter dated 10.2.1949 and have advised our Calcutta Office to instruct our Bhagalpur Branch to pay your allowances in future.

Yours faithfully,

[illegible]

Agent.

পরিশিষ্ট ৬

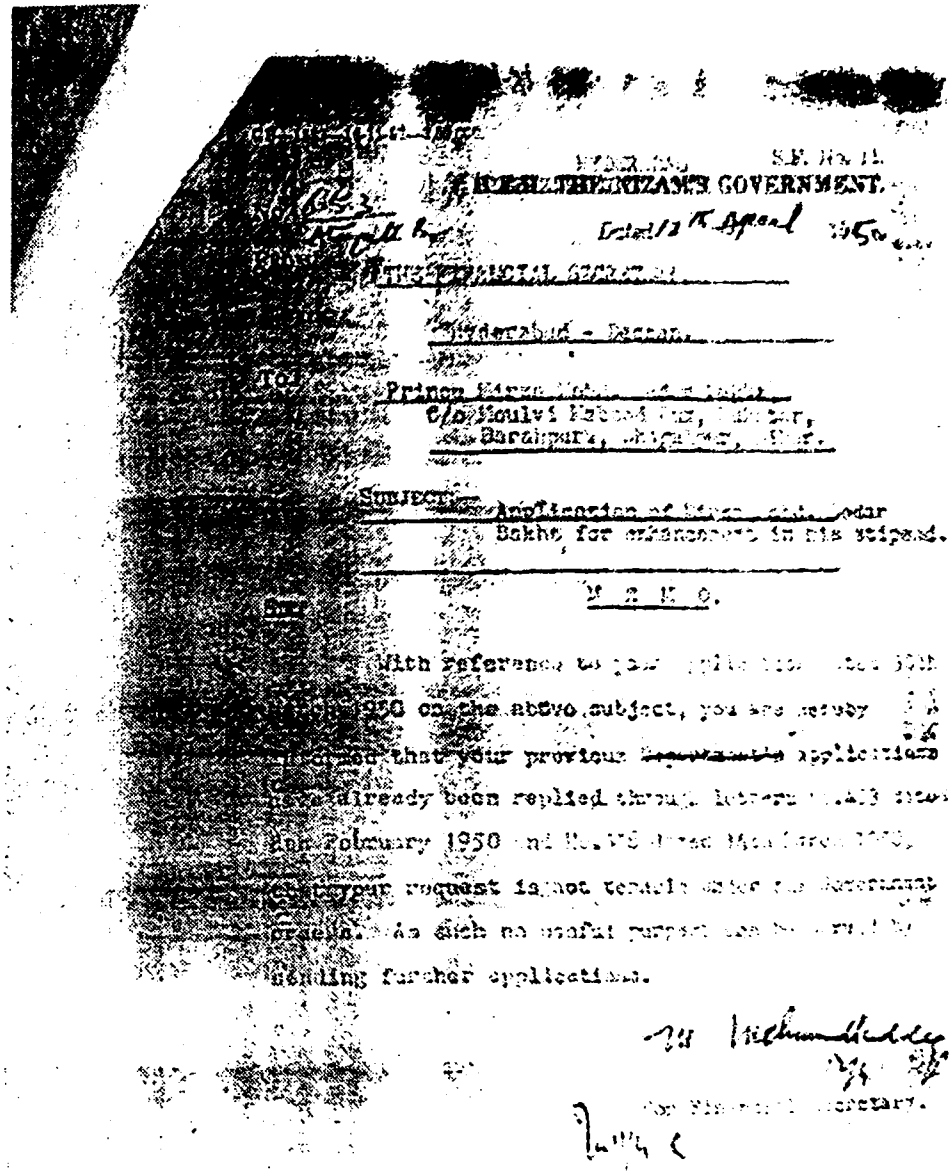

S.F. No. [illegible]

[illegible] THE NIZAM'S GOVERNMENT.

Dated 12th April 1950

THE FINANCIAL SECRETARY

Hyderabad - Deccan.

TO: Prince Mirza [illegible]
C/o Moulvi [illegible], [illegible],
Barakpur, [illegible].

SUBJECT:— Application of Mirza [illegible] Bakht for enhancement in his stipend.

M E M O.

With reference to your application dated [illegible] [illegible] 1950 on the above subject, you are hereby informed that your previous ~~[illegible]~~ applications have already been replied through letters [illegible] dated [illegible] February 1950 and No. [illegible] dated [illegible] 1950, that your request is not tenable under the [illegible] [illegible]. As such no useful purpose can be served by sending further applications.

[illegible]

for Financial Secretary.

পরিশিষ্ট ৭

IMPERIAL BANK OF INDIA

INCORPORATED IN INDIA UNDER THE IMPERIAL BANK OF INDIA ACT 1920
THE LIABILITY OF THE MEMBERS IS LIMITED

ALL LETTERS TO BE ADDRESSED TO THE AGENT
TELEGRAPHIC ADDRESS "THISTLE"

BHAGALPUR 17th Dec. 1952.

No. 5014

Mirza Mohamed Baydar Bukht, Esq.,
Maulanachak,
Bhagalpur.

Dear Sir,

Grant of Rs. 50/- on account of Hyderabad Government

Under instructions of Hyderabad State Bank, Hyderabad, we have to advise that they have cancelled their standing instructions to pay you Rs.50/- per mensem on account of Hyderabad Government grants.

You are now advised to apply to the Accountant General's Office (Pension Branch), Government of India, Hyderabad State, Hyderabad (Deccan) stating full details of your grant of Rs.50/-.

Please acknowledge receipt of this letter.

Yours faithfully,

Agent.

পরিশিষ্ট ৮

No.

OFFICE OF THE ACCOUNTANT-GENERAL
GOVERNMENT OF INDIA
Hyderabad-Dn.

Enclosures

Branch Amanullah No 9 Dated ....195 .

From

The Accountant-General,
Hyderabad-Dn.

To The Accountant General
Bihar.

Subject:- Issue of R.P.(B?)

Sir,

In continuation of this office letter No.Pcl 160/ 23-1-53 I am to request you to kindly intimate the issue of Pension Payment Office with number & date in the name of Shri Mohd Haydar Bukht at Bhagal Pur treasury.

Yours faithfully

Assistant Accounts Officer

No 1377 D. 28-3-53

Copy forwarded to Shri Mohamed Hayder Bakht c/o Astique Hossian Mohiuddin pur Mohalla P.O. Habib pur District Bhagalpur Bihar with reference to his application dated 5-3-53 for information.

Assistant Accounts Officer

পরিশিষ্ট ৯

GOVERNMENT OF HYDERABAD

No. 4407/343/54/At DATED 22/12/1954

From

The Secretary to Government,
Finance Department,
Hyderabad-Deccan.

To

Mr. [redacted] Mirza Mohammad Baydar Bukht,
c/o Shri Ashique Hussain, Imambara Lalle Mian,
Mohiuddeenpur, Post Office Nathpur, Bhagalpur, (Bihar)..

Subject— Regarding continuance of the Special pension.

His applications dated 22-11-1954 and dated 6-12-1954 addressed to Finance Minister, Hyderabad.

*****

Sir,

Special Pensions (Mahawarat Khas) chargeable to H.H.54-A-Territor and Political Pensions hitherto paid from the Hyderabad Government have ceased to be payable with effect from 1st August 1954 under the Hyderabad (Abolition of Cash Grants) (Amendment) Act 1954 implemented through the Finance Department letter No. 2682/At., dated 18-8-1954 with the exception of those where the age of the grantees is (60) or above on 1st April 1954 in which case the payment has been allowed to be continued for the lifeti of the recipients.

In case he qualifies himself in the manner indicated above, he is required to obtain the age certificate from the Civil Surgeon of the concerned District and submit it to the Accountant General, Hyderabad, to enable him to review his payment.

(C.R.Sheshadri),
Assistant Secretary,
Finance Department.

পরিশিষ্ট ১০

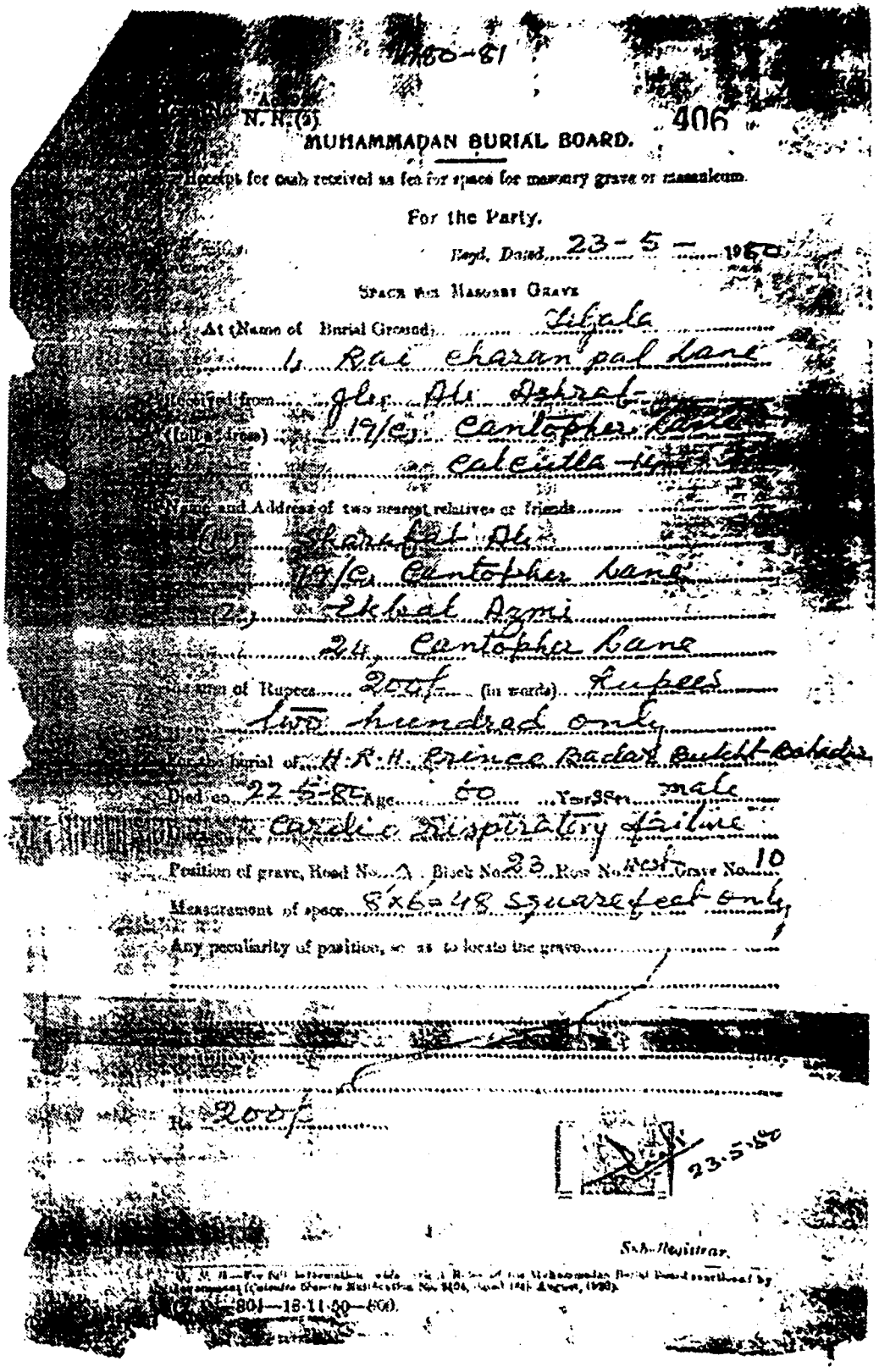

1980-81

N. R. (3). 406

MUHAMMADAN BURIAL BOARD.

Receipt for cash received as fee for space for masonry grave or mausoleum.

For the Party.

Regd. Dated 23 - 5 - 1980

SPACE FOR MASONRY GRAVE

At (Name of Burial Ground) Tiljala

4 Rai Charan pal Lane

Received from Ghu Ali Ashraf

(Full address) 19/C Cantopher Lane

Calcutta

Name and Address of two nearest relatives or friends

(1) Sharafat Ali

19/C Cantopher Lane

(2) Ekbal Azmi

24 Cantopher Lane

The sum of Rupees 200/- (in words) Rupees two hundred only

For the burial of H. R. H. Prince Nadar Bukht Bahadur

Died on 22-5-80 Age 60 Years Sex male

Disease Cardiac Respiratory failure

Position of grave, Road No. A Block No. 23 Row No. West Grave No. 10

Measurement of space 8x6=48 square feet only

Any peculiarity of position, so as to locate the grave

Rs. 200/-

23.5.80

Sub-Registrar.

N. B.—For full information, vide ... Rules of the Muhammadan Burial Board sanctioned by Government (Calcutta Gazette Notification No. ..., dated 14th August, 1930).

...801—15-11-80—800.

পরিশিষ্ট ১১

No.33/02/1980-FF(P)
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
Freedom Fighters Division
(Policy Section)

Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110 003
Dated the 18th January 2010.

To

The Accounts Officer,
Pension Payment(Central),
Office of the Accountant General (A&E),
West Bengal,2, Government Place,
Treasury Building,
KOLKATTA-700 001.

Subject :- Grant of dependent political pension to Smt. Sultana Begum widow of late Mirza Mohd. Bedar Bakht, Great Grandson of last Mughal Emperor late Bahadur Shah Zafar II from Central Revenues – regarding enhancement of pension.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's sanction letter of even number dated 5th December, 1980(copy enclosed) on the subject noted above and to convey the sanction of the President to enhance the dependent political pension to Smt. Sultana Begum widow of late Mirza Mohd. Bedar Bakht, resident of 103/12/C, Foreshore Road, P.O. Shibpur, Howarah-711 102 from Rs.400/-(Rupees four hundred only) per month to Rs.6000/- (Rupees six thousand only) per mensem from Central Revenues. This enhancement has been agreed to by the Government as a very special case on account of the exceptional nature of the case and on humanitarian considerations. This pension will be tenable during her life-time and terminable on her remarriage. No claim from any other member of her family will be entertained. The enhancement of pension will be effective from the issue of this letter.

2. The expenditure involved will be debitable to the Major Head "2075- Miscellaneous General Services", 00.101 Pensions in lieu of resumed jagirs, lands territories, etc., 04- Other Pensions, 04.00 – 04 Pensionary Charges Grant No.54 - Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs during the year 2009-10.

3. This issues with the concurrence of Integrated Finance vide their Dy. No. 6089 Fin.V/09 dt. 2.12.2009.

Yours faithfully,

(H.C. Bhanot)
Under Secretary to the Government of India

Copy forwarded for information to:-

1. The State Bank of India, Shibpur Branch, Ganges Garden Compound, Shibpur, 106 Kiran Chandra Singh Road, Howrah, West Bengal.
2. The Chief Secretary, Government of West Bengal, Kolkatta.
3. Smt. Sultana Begum widow of late Mirza Mohd. Bedar Bukht, 103/12/C, Foreshore Road, P.O. Shibpur, Howarah-711 102 (West Bengal).
4. The District Magistrate, Howrah, West Bengal.
5. The Treasury Officer, Howrah, West Bengal.
6. The Finance-V Branch, MHA, North Block, New Delhi
7. The Budget-I Section, MHA, North Block, New Delhi.
8. Judicial-PP Section, MHA, Jaisalmer House, New Delhi.
9. The Sanction Folder.
10. One spare copy

(H.C. Bhanot)
Under Secretary to the Government of India

পরিশিষ্ট ১২

Arup Roy
Minister-in-Charge
Agricultural Marketing Department
Government of West Bengal
&
Chairman, West Bengal State Marketing Board
Writers' Buildings, Kolkata - 700 001
[illegible]

Phone Office (033) 2214 5701
Fax : (033) 2214 5432
Residence (033) 2638 5889

তাং. 23.07.12

Dear [illegible],

Kindly find enclosed a self-explanatory prayer from Sultana [illegible] descendant of Bahadurshah Zafar, the last Moghul Emperor of India. I have gone through the prayer. In the paragraph no. 7 she has mentioned that OSD, KIT summoned her to his office and told that her prayer is justifiable but due to non-availability of flat it was not possible to allot flat in favour of her.

May I draw your kind attention to ask your officer to have the matter examined further on the availability of the same at present? I would be highly grateful to you if you consider this case appropriately to do the needful for the widow with six offsprings to give a permanent shelter for living.

Yours sincerely,

(Arup Roy)
[illegible]

Janab Firhad Hakim,
Minister-In-Charge,
UD& MA Departments,
Govt. of West Bengal

পরিশিষ্ট ১৩

From.
Sultana Begum
Great grand daughter-in-law of
Bahadurshah Zafar, last Moghul emperor of India
103/12/C, Foreshore Road,
Shibpur, HOWRAH-711 102.
M-09319-32545

To,
Shri Arup Roy
Hon'ble Agri-Marketing Minister
Govt. Of West Bengal
Kolkata/Howrah

Respected Sir,

Reg. : Request to arrange for re-allotment a govt. quarters to me in lieu of surrendered one

It is known to every one that Bahadurshah Zafar was arrested by the British for patronising freedom fighters.

India became independent, but my husband, direct descend of Zafar did not get any place to live in as compensation and had to spend his life in a rented tiny room in central Kolkata. After his death in 1980, the land lord started to force me to vacate the room. I had six children, all minors, to fend them

On hearing my sad story, the state govt. was pleased enough to allot me a class-C KIT (then CIT) flat on rent on Prince Anwarshah Road, in 1981. I took over it in July, 1981 with my children after depositing required amount of sum, as security, rent and service charge etc

But I could live there only upto November, 1982 as local goons started to harass me to occupy my flat. I abandoned it for my and my children's safety and surrendered it in 1985 to KPT as it declared me defaulter. I did not deposit rent further as I was not living there.

Now, I was again homeless. Anyhow I found a shelter in a south Howrah slum situated on KPT land and I am residing there since 1984.

But this premises is under dispute due to tussle between lease holder and the KPT and may be sealed/demolished at any time. Assuming this danger, I started to write to the state govt. to re-allot me my lost flat from 2004 and the file started to move only after Gopal Krishna Gandhi, the then governor, W.B., recommended in my favour.

At last the file reached KIT in 2006 and the OSD, who summoned me, told that I am eligible for re-allotment of a flat, but there is available no vacate KIT flat.

Sir, you have visited my place of dwelling a number of times and know my condition well. Therefore, hereby I most humbly request your honor kindly to forward my application to appropriate ministry/directorate/department for a government quarters to me with favorable recommendation. For this, I will remain always grateful to you.

I will prefer a quarters in Howrah.

Yours sincerely,

Sultana Begum

(Sultana Begum)

Date 23.07.2012

23/7/12

Encl : Xerox copies of the documents in support in my claim (4).